# জগৎ সংসার

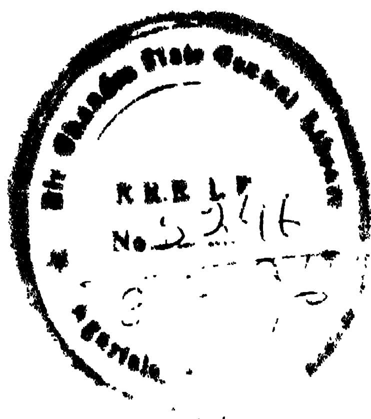
ISBN-81-7334-054-4

| |
|---|
| Price : Rs. 40.00 only |
| চল্লিশ টাকা মাত্র |

UJJAL SAHITYA MANDIR

# জগৎ সংসার

প্রফুল্ল রায়



উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭

JAGAT SANSAR
A novel by
PRAFULLA ROY.
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR.
C - 3 College Street Market,
Calcutta - 700 007.

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

*পরিবেশক*
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

*প্রতিষ্ঠাতা*
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

*প্রকাশিকা*
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি - ৩ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা - ৭০০ ০০৭

*বর্ণসজ্জায়*
কসমিক
*মুদ্রণে:*
হিন্দুস্থান আর্ট এনগ্রেভিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
২৪, ডাঃ কার্ত্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

ISBN–81–7334–054–4

# জগৎ সংসার

এই লেখকের
আরো কয়েকটি বই

প্রতিধ্বনি
মধ্যবর্তনী
কিন্নরী
সসাগরা
আকাশের সীমা নেই
হঠাৎ বসন্ত
পৃথিবীর শেষ ষ্টেশন

অন্য দিন ভোর হতে না হতেই বিছানা থেকে উঠে পড়ে লখিন্দর। এটা অর চিরকালের অভ্যাস। কিন্তু আজ ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায়। কাল মাঝরাতে খুম জ্বর এসেছিল। জ্বরের তাড়সে ভোর পর্যন্ত সে ককিয়েছে। অরপর কখন দু'চোখের পাতা জুড়ে এসেছিল, টের পাওয়া যায় নি, তাই সূর্যোদয়ের আগে আর উঠতে পারে নি।

ঝাঁঝরা টিনের চালের অগুণতি ফুটো দিয়ে রোদের তেরছা ফলাগুলো চোখে মুখে এসে বিঁধতেই সে ধড়মড় করে উঠে পড়ে। আর তখনই চাপা নিচু গলার গুনগুনানি কানে ভেসে আসে। নিশ্চয়ই বাইরের দাওয়ায় বসে সারী গাইছে।

সারীর গানে মোহিত হয়ে শুয়ে থাকার মতো আদৌ সময় নেই লখিন্দরের। রোদ উঠে গেছে। বাদায় বা বিলে গিয়ে হয়তো দেখবে চারিদিক সুনসান, একেবারে শূন্য। পাখপাখালি নেই। কাঁকড়া বা কচ্ছপ-টচ্ছপ সব উধাও। দ্রুত উঠে পড়ে লখিন্দর।

তাদের এই ঘরখানা ক'বছর ধরে হেলে আছে। কখন যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। মাথার ওপরের চালের মতোই চারপাশ ভাঙাচোরা টিনের, মাটির মেঝে। ঘরের খুঁটিগুলোও ঘুণে ধরা।

একধারে ছেঁড়া মাদুরে জড়ানো কয়েকটা বাড়তি কাঁথা বালিশ। সেগুলোর পাশে দুটো পুরনো টিনের বাক্স, সিলভারের তোবড়ানো কিছু বাসন-কোসন, আড়াইখানা মোমবাতি, দেশলাই, একটা হেরিকেন, কুপী, কেরোসিন তেলের বোতল, সরষের তেলের শিশি, কৌটো-বাটা, মাটির হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদি।

একদিকের বেড়ার গায়ে লক্ষ্মীর একখানা পট ঝোলানো রয়েছে। তার উল্টোদিকের বেড়ায় সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের ছবি আঠা দিয়ে জম্পেশ করে সাঁটা। এ সব সারীর কাজ। কার কাছ থেকে যেন চেয়েচিন্তে ওগুলো নিয়ে এসেছে। সিনেমা দেখার ভীষণ শখ অর, কিন্তু লখিন্দরের যা রোজগার তাতে বউ-এর শখ মেটানো অসম্ভব।

ঘরের আরেক কোণে রয়েছে আটার হাঁড়ি, লম্বা লম্বা ক'টা বাঁশ। প্রতিটি বাঁশের ডগায় তালপাতা কেটে ছোট ছোট খোপ বানিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। আর রয়েছে কাঠের হাতল বসানো পাখি-ধরা জাল। আছে ছোট বড় ক'টা পাখির খাঁচা। খাঁচাগুলো এখন ফাঁকা।

এই প্রায় ধসে-পড়া ঘর আর তার ভেতর তুচ্ছ ক'টা জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেই লখিন্দরের। অনেক কাল আগে লাটে কিছু চাষের জমি ছিল। পেটের জন্য কবেই সে সব বেচে দিতে হয়েছে।

লখিন্দর ঘরের কোণ থেকে আটার হাঁড়ি, জাল, খাঁচা ইত্যাদি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। দাওয়ার একধারে সারী এনামেলের থালার ওপর ঝুঁকে চালের খুদ বাছছিল। বাছতে বাছতে গুনগুন করছিল। এই গুনগুনানিটাই খানিক আগে লখিন্দরের কানে এসেছে।

সারী যে গানটা গাইছে সেটা বহুবার শোনা। 'মনের আগুন, তুষের আগুন, পরাণ জুইলে যায়.....' এই গানটা তার বড়ই প্রিয়। গানটা যেন তাকে জাদু করেছে।

সারীর বয়স সাতাশ আটাশ। কিন্তু শরীরের বাঁধুনি এখনও অটুট। আট-দশ বছরের বিবাহিত জীবনে ছেলেপুলে না হওয়ায় স্বাস্থ্য এতটুকু টসকায় নি। তার চেহারা এমন যে তার দিকে একবার তাকালে যে কোনো পুরুষের রক্ত চনমন করে ওঠে, শিরায় শিরায় উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়।

লখিন্দর তার উল্টো। এককালে সে লম্বা-চওড়া পাহাড়ের মতো বিরাট একটা মানুষ ছিল, এখন ভেঙেচুরে একেবারে ধ্বংসস্তূপ।

শান্ত উদাসীন চোখে একবার সারীর দিকে তাকায় লখিন্দর। এর মধ্যেই চান সেরে নিয়েছে সারী, ভেজা চুল পিঠময় ছড়ানো। পরনে পরিস্কার ডোরা-কাটা রঙিন শাড়ি। সারাদিনই এ রকম ভাল ভাল শাড়ি পরে পটের বিবিটি সেজে থাকে সে। কোনো কোনো দিন তার চুল থেকে ভারি সুন্দর গন্ধও বেরোয়। এই শাড়ি-টারি বা গন্ধতেল সারীকে কখনও কিনে দেয় নি লখিন্দর। তবে এ সব তাকে কে জোগায় মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে সে। অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় তার। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য বারোমাস জলে স্থলে যার অবিরাম যুদ্ধ তার কি এ সব দিকে নজর দিলে চলে?

লখিন্দর শুধোয়, 'ঘরে চিড়ে-মুড়ি কিছু আচে?'

সারী গান থামিয়ে প্রায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে, না, লেই। ঘরে তো চিড়ে-মুড়ির আড়ত বসিয়ে রেখেচ!'

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় কোনো রকম প্রতিক্রিয়াই হয় না লখিন্দরের। সে শান্ত গলায় বলে, 'না থাকলে কী আর করা।'

'তোর হাঁড়িতে চাড্ডি বাসি ভাত লিচ্চয় আচে—না রে?'

সারী নিস্পৃহ সুরে বলে, 'আচে।'

'বেড়ে ফ্যাল। আমি চোখে মুখে জল দিয়ে আসি।' বলে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে পড়ে।

উঠোন আর কী, ঘরের সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর কচুরিপানায় ঠাসা সরু একটা খাল, খালের ওপর সাঁকো। সাঁকোর ওধারে গ্রামের অন্য সব বাড়িঘর। দেখেই টের পাওয়া যায় এটা গরীব হাভাতেদের গাঁ।

খাল থেকে মুখ ধুয়ে আসে লখিন্দর। ততক্ষণে ভাত বেড়ে ফেলেছে সারী। লখিন্দর খেতে বসে যায়।

সারী বলে,'রাতভোর জ্বরে কোঁ কোঁ করেচ। এর ওপর বাসি ভাত গিলে কিচু হলে আমার কিন্তু দোষ লেই।'

লখিন্দর উত্তর দেয় না। ভাত খেয়ে জ্বর আসে তো আসবে। পেটে ভারী কিছু না পড়লে শরীরে জোর পাবে কেমন করে? দুর্বল শরীরে বাদা আর বিলে ঘুরে পাখি ধরা অসম্ভব। পাখি ধরতে না পারলে নিজেই বা খাবে কী, সারীকেই বা কী খাওয়াবে?

গোগ্রাসে ভাত খেয়ে আঁচিয়ে এসে লখিন্দর বলে, 'আমার গরম জামাটা এইনে দে। হাওয়া বড্ড ঠাণ্ডা।'

সারী ঘর থেকে পোকায়-কাটা বহুদিনের পুরনো একখানা রোঁয়াওলা সোয়েটার এনে লখিন্দরকে দিতে দিতে বল, 'বিল থেকে ফেরার পথে একবার শাসমলবাবুদের আড়ত হয়ে এস। কাল সনঝেবেলায় শাসমলবাবু লোক পাঠিয়েছিল। তুমি নাকিন পাঁচদিন ধরে ওমুখো হচ্চ না।'

লখিন্দর বলে, 'গিয়ে কী করব? পাখি ধরতে পারি নি। খালি হাতে গেলে শাসমলবাবু কি খুশিতে লেচে উঠবে?'

সারী বলে, 'আগাম টাকা লিয়ে বসে আচো। পাখি ধরতে না পারলেও একবার দেখা করে এস, লইলে খেপে যাবে। শাসমলবাবুর ওপর আমাদের দুজনার জেবন নেভভর (জীবন নির্ভর)।'

'তা ঠিক। তবে আসল নেভভরটা হল গে পাখির ওপর। শীত পড়ে গেল কিন্তুন এখুনও তেমন পাখপাখালি ইদিকে আসচে না। দু'চারদিনের ভেতর না এলে আর বাঁচতে হবে নি।'

লখিন্দর পাখি-ধরা জাল-টাল নিয়ে সাঁকোর দিকে পা বাড়াতেই সারী বলে, 'এট্টু দাঁড়িয়ে যাও।' বলে ঘরে চলে যায়। খানিক পরে একটা

কাগজের ঠোঙায় চাল-কড়াই ভাজা এনে লখিন্দরের হাতে দিতে দিতে বলে, 'দুকুরে (দুপুরে) খিদে পেলে খেয়ে নিও।'

এক সময় সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে যায় লখিন্দর।

## দুই

গাঁয়ের ভেতর দিয়ে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে মাঠের দিকে। বড় বড় পা ফেলে একটা হতচ্ছাড়া চেহারার টালির ঘরের সামনে এসে লখিন্দর ডাকে, 'ভূষণকাকা—অ, ভূষণকাকা—'

'কে লখা নাকিন রে? দাঁড়া আসচি।' বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে আসে ভূষণ। তার বয়স ষাটের ওপরে। কোলকুঁজো চেহারা একেবারে তেবরে গেছে। গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। পরনে ঠেটি কাপড় আর তালি-মারা ফতুয়ার ওপর ময়লা সুতি চাদর জড়ানো।

ভূষণ একজন ভূমিহীন চাষী। গায়ে যত দিন জোর ছিল পরের জমিতে লাঙল ঠেলে, ফসল ফলিয়ে, ধান কেটে রোজগার মন্দ হতো না। কিন্তু বছর দুই আগে হঠাৎ গলায় রক্ত উঠে সেই যে সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল তারপর থেকে বেশি খাটতে পারে না। অথচ তার সংসারে তিনটি প্রাণী—সে, তার স্ত্রী আর একটা মেয়ে। এই তিনটে পেটের দানা জোটাতে লখিন্দরের সঙ্গে সে-ও রোজ সকালে বিলে বাদায় ছোটে। পাখি-টাখি সে বিশেষ ধরতে পারে না। তবে মেঠো কচ্ছপ, বিলের মাছ, বিলের ধারের জঙ্গলের নানা রকম ফলপাকড়, মেটে আলু জুটিয়ে আনে। কিছু বিক্রি করে দেয়, কিছু নিজেরা খায়। এইভাবে উঞ্ছবৃত্তি করে কোন রকমে টিকে আচে।

ভূষণ বলে, 'বেলা অনেকখানি চড়ে গেচে। ভাবলাম তুই বুঝি আজ বেরুবি না।'

লখিন্দর বলে, 'না বেরুলে কি চলে? তুমি যাবে না?'

'যাব বৈকি। ঘরে একদানা চাল নেই—'বলতে বলতে ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁকে, 'হেই রে কমলা, আমার জাল-টালগুলো এইনে দে।'

একটা রোগা চেহারার সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে অর্থাৎ কমলা পাখি ধরার সরঞ্জাম এনে ভূষণের হাতে দেয়।

তারপর দুটি মানুষ খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের সীমানা পার হলে ধানখেত শুরু। মাঠ এখন একেবারে ফাঁকা। অঘ্রাণের শেষের

দিকে জমির মালিকরা ফসল কেটে নিয়ে গিয়েছিল। ধু ধু শস্যক্ষেত্র লোকজন বিশেষ চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে দু-একটা গোসাপ পেট টেনে টেনে চলেছে, আর আছে মেঠো ইঁদুর। দূরে দূরে বেজায় ঢ্যাঙা চেহারার তালগাছ খাড়া আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে।

মাঠের পাশ দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের মেটে রাস্তা। রোজই সেই রাস্তা ধরে খানিকটা যাবার পর লখিন্দর আর ভূষণ জমিতে নেমে পড়ে। তারপর কোণাকুণি মাইল দেড়-দুই হেঁটে বিলে পৌঁছে যায়।

আজও পাশাপাশি হাঁটছিল তারা। দুজনেরই চোখ আকাশের দিকে। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে তারা পাখি খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ফসলকাটা মাঠের আকাশটাও ফাঁকা।

চিন্তিতভাবে ভূষণ ডাকে, 'হাঁ রে লখা—'

অন্যমনস্কর মতো লখিন্দর সাড়া দেয়, 'কী কইচ?'

'আকাশের গতিক তো সুবিধের লয়। পাখপাখালি কিচুই লজরে আসচে না।' ভূষণ বলে যায়, 'তোর চোখের জোর বেশি। দেখতে পাচ্ছিস কিচু?'

আকাশের দিকে চোখ রেখেই লখিন্দর বলে, 'না।'

'ক'দিন ধরে পেরায় (প্রায়) খালি হাতে ঘরে ফিরতে হচ্চে। আজ কিচু না লিয়ে গেলে বড় বেপদ। উপুস দিয়ে মরতে হবে।'

'হাঁ।'

'এখেন থিকে কুথাও গিয়ে যে দুটো পয়সা রোজকার করব তারও উপায় লেই। কে কাজ দেবে আমাদের?'

'হাঁ।'

ভূষণ একটু বিরক্ত হয় বলে, 'কি হাঁ হাঁ করছিস?'

লখিন্দর বলে, 'পাখপাখালির মতিগতি কি কিচু কওয়া যায়। এ বচ্ছর যদিন তারা ঠিক করে ফ্যালে ইদিক পানে আসবে নি, তা কী আর করা যাবে?'

অসহিষ্ণু ভাবে ভূষণ বলে, 'ফি বচ্ছর আসচে। এ বচ্ছর এসবে (আসবে) না কেন?'

'উই যে মতিগতির কথা কইলাম।'

'হুঁ। অমন মতিগতি হলে আমাদের চলে!' ভূষণ বলে, 'পাখি না এলে পেরানে মরে যাব যে—'

লখিন্দর উত্তর দেয়, 'তা ঠিক। কিন্তন'—

তার কথা শেষ হবার আগেই সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ শোনা যায়। আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে আনে লখিন্দর আর ভূষণ।

উল্টোদিক থেকে সাইকেলে চেপে আসছে নটবর—নটবর বেরা। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। ভারি শৌখিন মানুষ সে।

পুরু ঠোঁটের ওপর চিকন গোঁফ। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে কানের ওপর লতিয়ে দিয়েছে। পরনে ফিনফিনে ধুতির ওপর ধবধবে হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। তার ওপর বাহারী পুল-ওভার। গলায় সোনার সরু চেন, দু'হাতে গোটা পাঁচেক আংটি।

এখান থেকে দক্ষিণ দিকে মাইল দুই গেলে নদী। তার পাড়ে জমজমাট একটা গঞ্জ—নাম কুলতলি। সেখানে দিশী মদ আর ভাং-গাঁজার দোকান আছে নটবরের। দস্তুরমত সরকারি লাইসেন্স নিয়ে সে ব্যবসা চালায়।

নটবরকে দেখে চোখ কুঁচকে যায় ভূষণের। সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নটবর কাছাকাছি এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়। এই শীতের সকালেই জামা-কাপড়ে দামী সেন্ট ঢেলে এসেছে। ভুর ভুর করে তার গা থেকে সুগন্ধ উঠে আসছে। আবছা ভাবে লখিন্দরের মনে হয় ঠিক এই রকমই মিষ্টি সুবাস মাঝে মাঝে সে সারীর গা থেকে পায়।

নটবরের চোখে মুখে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে যেমন হয় অনেকটাই সেই রকম। নেহাত লখিন্দরের মুখোমুখি পড়ে গেছে বলে তাকে সাইকেল থেকে নামতে হয়েছে।

নটবরের সঙ্গে অনেক দিনের জানাশোনা লখিন্দরের। গঞ্জে তার দোকানের ঠিক উল্টোদিকে শাসমলবাবুদের আড়ত। পাখপাখালি ধরা পড়লে লখিন্দরকে প্রায় রোজই সেখানে যেতে হয়। নিয়মিত কুলতলিতে যাতায়াত করতে করতে নটবরের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে।

নটবর পকেট থেকে ফুল-আঁকা রুমাল বার করে মুখ মুছে কুণ্ঠিত একটু হাসে। বলে, 'বিলে পাখি ধরতে যাচ্চ, মনে হচ্চে?'

নটবরকে দেখে লখিন্দরের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। এই লোকটাকে দেখলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায় তার। কিন্তু কখনো ভেতরের ঝাঁঝ বাইরে বেরিয়ে আসতে দেয় না। নিস্পৃহ গলায় সে বলে, 'হাঁ।'

'ক'দিন তুমাকে শাসমলবাবুদের আড়তে দেখি নি তো।'

'এই যাওয়া হয় নি।'

একটু চুপচাপ। তারপর নটবর যেন কৈফিয়ৎ দেবার সুরেই বলে ওঠে, 'সক্কালবেলা সাইকেলে চেপে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে তুমাদের ইদিকে চলে এলাম।'

লখিন্দর উত্তর দেয় না।

নটবর এবার বলে, 'তুমাদের গাঁয়ে ক'জনার কাছে অনেক ট্যাকা পড়ে আচে। ভাং-গাঁজা ধারে নিয়ে হজম করে ফেলেচে। পয়সা দেবার নাম নেই। আজ য্যাখন ইদিকে এসেই পড়েচি, ট্যাকা উসুল না করে যাচ্চি না।'

টাকা আদায়ের ব্যাপারটা যে বাজে অজুহাত, লখিন্দর তা জানে। কী উদ্দেশ্যে নটবর এখানে হানা দিয়েছে সেটা সে ভাল করেই বোঝে। সে এবারও চুপ করে থাকে।।

নটবর বলে, 'যাক্‌গে, তুমাদের আর আটকাব নি। বেলা চড়ে যাচ্চে, এরপর বিলে গিয়ে কিচ্চু পাবে নি। চলি গ—'

নটবর সাইকেলে চেপে চলে যায়। লখিন্দর আর ভূষণ হাঁটতে শুরু করে।

ভূষণ গলা নামিয়ে ডাকে, 'হেই রে লখা—

লখিন্দর শান্ত চোখে ভূষণের দিকে তাকায়।

ভূষণ বলে, 'তোরে একটা কথা ক'দিন ধরে বুলব বুলব ভাবছিলাম।'

'কয়ে পেল।'

'তুই কি জানিস, য্যাখন তুই বাদায় আর বিলে ঘুরে বেড়াস, ওই শালো গ্যাঁজাভাংওলা তোর মাগের কাচে আসে?'

'তুমিও তো আমার সন্‌গে বিলে বাদায় ঘোরো। এই সব খপর তুমাকে কে দ্যায়?'

ভূষণের চোখ মুখ কুঁচকে যায়। প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে সে, 'আমি না হয় পেটের তরে হেথা হোথা ঘুরে বেড়াই। তাই বলে গাঁয়ের সব লোক ঘর ছেড়ে বেইরে পড়ে না। হেই রে লখা, তাদের চোখ লেই? তারা কি আঁধা (অন্ধ) হয়ে গেচে?'

লখিন্দর বিচলিত হয় না। বলে, 'দেখে যদিন কেউ থাকে, কী আর করা? ছাড় উসব—'

ভূষণ খেঁকিয়ে ওঠে, 'হেই রে শালো, সোম্‌সারে গাককি আর মান্‌ষের কথা ছেইড়ে দিতে বুলচিস?'

লখিন্দর নিরুত্তর। লম্বা লম্বা পা পেলে সে মাঠ ভাঙতে থাকে।

ভূষণ এবার গলার স্বর নামিয়ে পরম হিতাকাঙক্ষীর মতো বলে, 'ঘর সামলা লখা।'

লখিন্দর এবারও চুপ।

ভূষণ সমানে বকে যায়, 'হেই রে লখা, তোর মাগের সন্‌গে ওই গুয়োর ব্যাটার ছেলের জানাশুনো হল কি করে?'

কীভাবে চেনাজানা হয়েছে সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে লখিন্দর। পেটের জন্য উদয়াস্ত তাকে বাদায় বা বিলে পড়ে থাকতে হয়। কিন্তু পাখি-টাখি ধরলেই পেট ভরে না। সংসারে অনেক কিছুই লাগে—তেল, নুন, মশলাপাতি, কেরোসিন, চাল, ডাল, এমনি হাজার জিনিস। এসব যোগাড় করতে সারীকে গঞ্জে যেতে হয়। মাঝে মধ্যে তাকে নানা দরকারে শাসমলবাবুদের কাছে পাঠিয়েছে লখিন্দর। তার ধারণা সেই সময় নটবরের সঙ্গে তার আলাপ হয়েচে। তবু সে বলে, 'কে জানেন কেমন করে হয়েচে!'

চলতে চলতে হঠাৎ কী ভেবে ভূষণ একবার পেছন ফিরে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। গলা চড়ায় তুলে চেঁচা।, 'আই লখা, শালো সুম্মুদি তোর ঘরের পানে চলেচে। চ, গাঁয়ের লোক জড়ো করে হারামজাদার ছাল ছাড়িয়ে দিই।'

লখা বলে, 'এ লিয়ে মাথা গরম করো নি। পেটের কথা ভাবো কাকা। কচ্ছপ, কাঁকড়া, পাখি-টাখি লজরে পড়ে কিনা সেটা দ্যাখো।' বলতে বলতে চলার গতি আরো বাড়িয়ে দেয়।

অগত্যা গজগজ করতে করতে ভূষণও লখিন্দরের পেছন পেছন হাটিতে থাকে।

## তিন

সাইকেলটা সাঁকোর গায়ে ঠেসান দিয়ে রেখে খালের ওপারে চলে যায় নটবর।

দাওয়ায় বসে খুদ বাছতে বাছতে হঠাত নটবরকে দেখে একটু চমকে ওঠে সারী। তার চোখে মুখে ভয় এবং উৎকণ্ঠার সঙ্গে একটু খুশিও চলকে পড়ে। সে বলে, 'তুমার বুকের পাটা বড্ড বেড়ে গেচে গ লটবরবাবু।'

'কি রকম?' নটবর চোখ কুঁচকে একটু হাসে।

'আগে তো বসো।'

'ঠিক আচে।' বলে নটবর দাওয়ার একধারে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মাটির ওপরেই বসতে যাচ্ছিল। সারী ব্যস্তভাবে ঘর থেকে একটা চাটাইয়ের আসন এনে পেতে দেয়।

নটবর বসতে বসতে বল, 'এবারে বল।'

'আগে লুকিয়ে-চুরিয়ে রাতের আঁধারে আসতে। আজ একেবারে দিনদুকুরে সব্বার চোখের সামনে দিয়ে উদয় হলে!'

'তা এলাম। ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে কী লাভ?'

'অ্যাদ্দিন পাখিওলার ঘরে চুপে চুপে সিঁদ কাটছিলে, আজ একেবারে ডাকাতি! তা—'

'তা কী?'

'তুমি যে এয়েচ, গাঁয়ের কেউ দেকে ফ্যালে নি তো?'

'হুঁ-উ-উ-উ, দেকেচে—' বলে ঘাড়টা অনেকখানি হেলিয়ে দেয় নটবর।

হকচকিয়ে যায় সারী। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কে দেকেচে?'

রহস্য করে চোখের তারা নাচিয়ে একটু হাসে নটবর। বলে, 'আসল লোক—'

'আসল লোক আবার কে?'

'কে আবার, তুমার পাখিওলা। লখিন্দর ভূষণের সন্‌গে বিলে যাচ্ছিল। তার সন্‌গে দু-চার কথা হল।'

সারীর চোখে-মুখে সন্ত্রাসের ছায়া পড়ে। কাঁপা গলায় শুধোয়, 'কী বুলল?'

লখিন্দর বলে, 'কী আবার বুলবে! পাখি-টাখি ছাড়া লোকটা কিচু বোঝে নাকিন?'

সারীর সংশয় এবং দুশ্চিন্তা কাটে না। সে বলে, 'বড্ড ডর লাগে গ। লোকটা আমারে পেরান দিয়ে ভালবাসে। কিচু ট্যার (টের) পেলে কী যে করবে!'

'ট্যার পেলে আমারে কী ছেইড়ে দিত! ঠিক পেছন পেছন চলে আসত। ভয় লেই গ, ভয় লেই।' বলে হাসে নটবর।

কথাটা এক দিক থেকে ঠিক। সন্দেহ করলে লখিন্দর নটবরকে কিছুতেই ছাড়ত না। বিলে না গিয়ে সোজা বাড়িতে ফিরে আসত। দুর্ভাবনা কিছুটা কাটে সারীর, মনটা অনেক হালকা হয়ে যায়।

এবার পকেট থেকে একজোড়া রূপোর ঝুমকো আর চুলের কাঁটা বার করে সারীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'কাল কলকাত্তয় গিয়েছিলুম, তুমার জন্যি কিনে এনিচি। দেখ দিকিন, পছন্দ হয় কিনা।'

সারীর চোখ লোভে খুশিতে ঝকঝকিয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে প্রণয়ীর উপহার নিতে নিতে বলে, 'এ সব আবার আনতে গেলে কেন? এত খরচা করে—'

সারীকে থামিয়ে দিয়ে নটবর বলে, 'ক'টা পয়সা আর খরচা!'

হাটু মুড়ে তার ওপর নিটোল চিবুকটি রেখে আড়ে আড়ে নটবরের দিকে তাকায় সারী। চোখ কুঁচকে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে বলে, 'একটা কথা শুদুই (শুধোই), ঠিক ঠিক উত্তর দেবে কিন্তুন—'

'কী কথা?'

'এই যে আমার কাচে আসো, অ্যাত দামী দামী জিনিস দাও, তুমার বিয়ে-করা মাগ ট্যার পায়?'

'তা-ই কখুনও পায়! তা হলে কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে দেবে না? আমার শ্বউর বড় জোতদার, গরমেণ্টের লাইসেন নিয়ে বন্দুক কিনেচে। জামাই-এর মন অন্য মেয়েমানষে কেড়ে লিয়েচে, জানতে পারলে সোজা এসে গুলি চালিয়ে দেবে।'

'কাকে মারবে? তুমাকে না আমাকে?'

'দু'জনারেই।'

'তবে তো বড্ড বেপদের কথা।'

'ও সব ছাড়ান দ্যাও তো। তুমি আমি ঠিক থাকলেই হল। কারো বাপের সাধ্যি লেই আমাদের ধরে!'

'তুমার মতলবখানা বেশ।'

'কিসের মতলব?'

চোখ নাচিয়ে মুখ মচকে সারী বলে, 'এই ঘরও রাখব, বারও রাখব। গাচেরও খাব, তলারও কুড়োব।'

নটবর বলে, 'ঘর ওই নামেই। মাগের সন্‌গে কুনো সম্পক্ক লেই। নেহাত শ্বউরটা আস্ত ডাকাত, তাই। তুমিই আমার সব্বস্ব গ। একেক সোময় কী ইচ্ছে হয় জানো?'

'কী?'

'তুমার সারা গা সোনায় মুড়ে দিনভর তাক্যে (তাকিয়ে) থাকি।'

বলতে বলতে নটবরের চোখ এবং কণ্ঠস্বর যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

রূপমুগ্ধ পতঙ্গটিকে তেরছা নজরে পোড়াতে পোড়াতে সারী বলে, 'আমার মদ্দাটারও (মরদাটারও) সেই রকম ইচ্ছে। কত বার বুলেচি, সুদিন এলে আমার মটরদানা হার, কানপাশা, চুড়ি, বালা গড়িয়ে বিবি সাজিয়ে কলকাতায় বেড়াতে নে যাবে। শহরের মানুষগুলানরে দেইখে দেবে তার মাগ ক্যামন রূপুসী।'

সারীর সাজ-টাজের ব্যাপারে লখিন্দরের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় খুশি হয় না নটবর। সে বলে, 'আগে কখুনও কলকাতায় গেচ?'

'নাঃ, কে নে যাবে? বাপও ছিল গরীব, পড়েচিও গরীবের ঘরে।'

'কলকাতায় যেতে সাধ হয়?'

'তা হবে না কেন? সেই ছোটবেলা থিকে কত শুনিচি কলকাতার কথা। সেখেনে কী লেই! থেটার, বাইস্কোপ, সার্কেশ, মাটির তলা দে রেলগাড়ি যায়। আমার বাবা কইত, কলকাতা না দেখলে জেবন বেথা।'

'যাবে তুমি কলকাতায়?' আগ্রহে সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে নটবর। বলে, 'আমি তোমারে নে যাব। তুমায় দেখলে কলকাতার মাথা ঘুইরে যাবে।'

সারী হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে আগের মতোই বসে আছে। গলা সামান্য হেলিয়ে চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে বলে, 'পরের মাগকে এমন করে লোভ দেখাতে লেই। অ্যাখন যাও গ বাবু, গাঁয়ের লোক কে কুথা থিকে দেকচে। আমার নামে এমন কুচ্ছে গাইবে যে কান পাতা দায় হবে।'

নটবর বলে, 'তুমার দেকচি বড্ড কুচ্ছোর ভয়!'

'হবে নি, ঘরের বউ না আমি। এবেরে ওঠ তো বাপু, আমার রান্না চড়াতে হবে। আর—'

'আর কী?'

'এমন হুট হুট চলে এসো নি।'

'ও নে (নিয়ে) মাথা ঘামিও নি। আচ্ছা অ্যাখন তা হলে ওটা যাক।' নটবর চলে যায়।

## চার

ফসল-কাটা ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে যায় ভূষণ আর লখিন্দর। সূর্য এখন গাছপালার আড়াল থেকে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে। চারদিকে যতদূর চোখ যায়, লোকজন চোখে পড়ে না। সব সুনসান, ধু ধু।

রোদ ওঠার পর ভোরের দিকের কুয়াশা কেটে যাওয়ায় আকাশটাকে এখন ঝকঝকে দেখাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে সাদা বকের ঝাঁক উড়ে চলেছে। অনেক উঁচুতে আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক'টা গাঙচিল ডানা মেলে শরীর ভাসিয়ে দিয়েছে বাতাসে।

মাঠে নেমে খানিক যাবার পর সারীর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে ভূষণের। সে পাখি-টাখি খুব একটা ধরতে পারে না। পাখি ধরার মতো অত ধৈর্য বা কৌশল কোনোটাই নেই তার। বাদায় এলে তার নজর চলে যায় মেঠো কচ্ছপ, কাঁকড়া গুগলি আর বিলের ধারের জঙ্গলের ফলপাকড়ের দিকে।

এখন চনমন করে ভূষণ মাঠে কচ্ছপ খুঁজছে। কিন্তু কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না।

লখিন্দরের চোখ মাটিতে নয়, অনেক উঁচুতে আকাশের দিকে। শিল্লি বা বুনো টিয়ার ঝাঁক খুঁজছে সে। কিন্তু নেই, নেই—টিয়াদের দেখা নেই।

এক সময় প্রকাণ্ড জোয়ান ছিল লখিন্দর। গায়ে ছিল বুনো মোষের শক্তি, বুকে দুর্জয় সাহস। নিজেদের সামান্য জমিজমা তো চষতোই, সেই সঙ্গে দুই বলদের একখানা লাঙল দিয়ে জানা কি মাইতি বাবুদের বিশ পঁচিস বিঘে জমিও চষে দিত। কেননা তাদের নিজস্ব যে জমি তার ফসলে সারা বছর দুটো পেট চলত না। হঠাৎ বছর তিনেক আগে শ্বাসকষ্ট আর হাঁফের রোগে সে এতই কাবু হয়ে পড়ে যে জমি চষার মতো মারাত্মক খাটুনির কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। শরীর নষ্ট হওয়া মানে পুরোপুরি বাতিল হয়ে যাওয়া। জমি মালিকদের কাছে তার দাম তখন কানাকড়িও না। অগত্যা পেটের জন্য যৎসামান্য জমিটুকু বেচতে হল। ক'টা পয়সা আর তাতে পাওয়া গেছে। সেগুলো ফুরোবার পর বাদা আর বিলের পাখপাখালিই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

খানিকক্ষণ বাদায় খোঁজাখুঁজির পর ক'টা মেঠো কচ্ছপ পায় ভূষণ আর লখিন্দর। তারপর দুজনে বিশাল বিলের ধারে চলে আসে।

বিলের পাড় ধরে অজস্র গাছগাছালি। এত বেলায় একটা ঝাঁকড়া শিশুগাছের মাথায় ক'টা বুনো টিয়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

অন্যবার অঘ্রাণের শেষাশেষি সমস্ত আকাশ নানা রঙের দূর দেশী পাখিতে ঢেকে যায়। লখিন্দর শুনেছে, এই সব পাখি আসে কোন এক শীতের দেশ থেকে। তাছাড়া দিশী পাখি তো আছেই।

লখিন্দর অন্তত আট-দশ রকম পাখির ডাক অবিকল ডাকতে পারে। পাখি ধরার এ একটা পুরনো কৌশল। এভাবে ডাকলে পাখিরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, মনে করে তাদেরই কেউ হয়তো ডাকাডাকি করছে এবং নিজেদের অজান্তেই পাখি-ধরা জালে ঢুকে পড়ে।

শিশুগাছের কাছাকাছি এসে আলটাকরায় জিভ ঠেকিয়ে চিক চিক আওয়াজ করতে করতে খুব সন্তর্পণে একটা জাল খানিক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে পাতে লখিন্দর। কণ্ঠস্বরে নানারকম ঢেউ তুলে মগডালের টিয়া দুটোকে একটানা ফুসলোতে থাকে।

ডাক শুনতে শুনতে গাছের মাথায় পাখিগুলো চনমন করে ওঠে। মাঝে মাঝে মাথা কাত করে খুব মনোযোগ দিয়ে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করে। এক সময় সামান্য উড়ে গাছের মাথায় একটা পাক দিয়ে ফের ডানা নাড়তে নাড়তে মগডালেই এসে বসে। অল্পক্ষণ পর আবার উড়ে আবার পুরনো জায়গায় ফিরে আসে। এইভাবে কিছুক্ষণ ওড়াউড়ির পর টিয়াগুলো হঠাৎ নিচে নেমে লখিন্দরের পাতা জালে ঢুকে পড়ে।

সবসুদ্ধ পাঁচটা টিয়া। পাখিগুলোকে জাল থেকে তারের খাঁচায় ঢুকিয়ে ফেলে লখিন্দর।

বাদায় বা বিলে ঘুরে ঘুরে ভূষণ যা যা জোগাড় করতে পারে সে সব তার। লখিন্দরের বেলাতেও তাই। ভাগাভাগির কোনো ব্যাপার নেই।

বেলা ক্রমশ চড়ছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে লখিন্দর বলে 'খিদেয় পেট জ্বলচে ভূষণকাকা।'

ভূষণ বলে 'আমারও।'

একটা গাছতলায় বসে লখিন্দর সারীর দেওয়া চালভাজা আর মটরভাজা খেতে থাকে। ভূষণও মুড়ি-টুড়ি নিয়ে এসেছিল, সে-ও খাওয়া শুরু করে।

খেতে খেতে ভূষণ বলে, 'আজ আর কিছু পাওয়ার ভরসা নেই। শরীলটাও বেজুত লাগচে। আমি ঘরে ফিরব। তুমি কী করবে?'

লখিন্দর বলে, 'আমায় একবার গঞ্জে যেতে হবে।' পাখিগুলোন শাসমলবাবুদের আড়তে পৌঁচে দিতে না পারলে চাল-ডাল কিনতে পারব নি। কয়েক মুঠো খুদ ছাড়া ঘরে কিচ্ছু লেই।'

'ঠিক আচে। তুই তাহলে যা—'

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে পাখির খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে লখিন্দর বিল পেছনে ফেলে মাঠের ভেতর দিয়ে কোনাকুনি হাঁটতে থাকে। ভূষণও তার

পাশাপাশি এগিয়ে চলে। এক সময় পঞ্চায়েতের কাঁচা রাস্তা এসে ডানদিকের পথ ধরে ভূষণ আর বাঁদিকে যায় লখিন্দর।

## পাঁচ

গঞ্জটা বেশ জমজমাট। নিচে খুব চওড়া নদী। ওপরে টানা বাঁধ। বাঁধের ধার বরাবর সারি সারি দোকানপাট আর আড়ত। এছাড়া একটু ভেতর দিকে গেলে হাই স্কুল, থানা, আবগারী অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক—সবই পাওয়া যাবে।

বাঁধের তলায় একধারে নৌকোঘাটা, তার খানিকটা দূরে লঞ্চঘাটা। যাত্রী বোঝাই করে সারাটা দিন দুটো লঞ্চ নদী পারাপার করে। লঞ্চঘাটার গা ঘেঁষে রেল স্টেশন। এখান থেকে সারাদিনে ছ'টা আপ ট্রেন কলকাতায় যায় আবার ফিরেও আসে।

নদীর ধারে শাসমলবাবুদের আড়ত। সামনের দিকে একখানা বড় পাকা ঘরে তাদের গদি। পেছনে টিনের চাল এবং ইটের দেওয়ালের বড় বড় গুদাম। সেগুলো ধান চাল তিল তিসি কড়াই আর পাটে বোঝাই।

গদি-ঘরে নিচু তক্তাপোশের ওপর পুরু ফরাস পাতা। সেখানে বিপুল চেহারার নিশিকান্ত শাসমল বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে আছে। লোকটার গায়ের রং কুচকুচে কালো, মনে হয় একবারে পালিশ-করা। চামড়া এত মসৃণ যেন মাছি বসলে পিছলে যাবে।

নিশিকান্তর সামনে ড্রয়ারওলা কাঠের ডেস্ক। পেছনে লোহার সিন্দুক। সবগুলো দেওয়ালেই ঠাকুর দেবতার ছবি টাঙানো। কুলুঙ্গিতে পেতলের সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি। প্রতিটি দেবদেবীর ফোটোতে এবং গণেশের গলায় টাটকা ফুলের মালা ঝুলছে।

ফরাসের সামনের দিকে একসারি কাঠের চেয়ার পাতা। যারা নানা দরকারে শাসমলবাবুদের কাছে আসে ওই চেয়ারগুলোতে বসে। এখন কিছু লোকজন বসে আছে গদি-ঘরে এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলছে।

শাসমলবাবুদের আড়তের সামনে দিয়ে রাস্তা গেছে। আড়ত থেকে কোনাকুনি ডানধারে, রাস্তার ওপারে নটবরের গাঁজা ভাং-এর দোকান।

লখিন্দর যখন বিল থেকে কুলতলিতে এসে পৌঁছুল সূর্য খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে। এখন বাঁধের ধারের রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে চোখের কোণ দিয়ে একবার নটবরের দিকে তাকায়। সেখানে ভনভনে

মাছির মতো ভিড়। গাঁজা ভাং আফিমের যে কত খদ্দের তার লেখাজোখা নেই। নটবরকে এখন তার দোকানে দেখা যাচ্ছে। সারীর কাছে থেকে কখন সে ফিরে এসেছে কে জানে।

লখিন্দরের চোখ দুটো পলকের জন্য জ্বলে ওঠে। পরক্ষণে মুখ ফিরিয়ে সে শাসমলবাবুদের গদি-ঘরে ঢুকে পড়ে।

হাতের ইশারায় তাকে বসতে বলে নিশিকান্ত। তারপর যাদের সঙ্গে কথা বলছিল তাদের দ্রুত বিদায় করে এবার পুরোপুরি লখিন্দরের দিকে তাকায়।

লখিন্দর কখনও নিশিকান্তর সামনে চেয়ারে বসে না। পাখি-ধরা জাল, খাঁচা, সব একধারে রেখে ফরাসের তলায় সিমেন্টের মেঝেতে উবু হয়ে বসে ছিল সে।

নিশিকান্ত বলে, 'সাপের পাঁচ পা দেকেচিস নাকিন রে শালো ?'

লখিন্দর উত্তর দেয় না। ভয়ে তার বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করতে থাকে।

নিশিকান্ত থামে নি, 'পাঁচ দিন ডুব মেইরি রইলি। লোক পেঠিয়ে খপর না দিলে আজকাল দেখি ইদিকে আসিস না।'

মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো মুখ করে বসে থাকে লখিন্দর।

নিশিকান্ত এবার বলে 'কথা বন্দ হয়ে গেল নাকিন রে ? পাঁচ ট্যাকা দশ ট্যাকা করে কত আগাম লিয়েচিস হুঁশ আচে ?'

কাচুমাচু মুখে লখিন্দর বলে, 'আচে বাবু। তা সত্তুর আসি তো হবেই।' একটু থেমে বলে, 'ক'দিন বিলে গিয়ে পাখি পাই নি। তার ওপর শরীলটায় জুত লেই। খালি হাতে এখেনে এসে কী করি বলেন ?'

নিশিকান্তর চোখ বার বার লখিন্দরের পাখিগুলোর দিকে চলে যাচ্ছিল। খাঁচার ভেতর তারা থাকতে চাইছিল না, সমানে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কিচির-মিচির করে যাচ্ছে। সে বলে, 'তা কী এনিচিস দেখি—'

লখিন্দরের গলা পেয়ে ভেতর দিকের একটা আড়ত থেকে গিরীন জানা গদিঘরে চলে আসে। বেশ সুপুরুষ চেহারা, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। পরণে পরিষ্কার ধুতি আর হাফ হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে শস্তা স্যাণ্ডেল।

গিরীন সারাদিন নিশিকান্তর আড়তে কাজ করে আর রাত্তিরে চারপাশে গাঁ-গঞ্জে যাত্রা করে বেড়ায়। বিশেষ করে শীতের মরসুমে মাঠ থেকে ধান

ওঠার পর। এই সময়টা লোকের হাতে বাড়তি কিছু টাকা পয়সা থাকে। আমোদ ফূর্তির দিকে তখন তাদের মন যায়। যাত্রার চেয়ে শস্তা আনন্দ আর কোথায় পাওয়া যাবে এই গ্রামাঞ্চলে।

গিরীনের নিজস্ব একটি যাত্রার দল আছে। পেটের জন্য শাসমলদের আড়তে চাকরি করতে হলেও যাত্রা তার কাছে নেশার মতো, তাতেই মশগুল হয়ে আছে সে।

গিরীন খুব ভালবাসে লখিন্দরকে। বেশ ক'বার সারী আঁর তাকে সে তাদের পালা দেখিয়েছে।

পাখির খাঁচা দুটো ওপরে তুলে নিশিকান্তকে দেখাতে দেখাতে লখিন্দর বলে, 'আজ এই ক'টা ধরতে পেরিচি।'

এক দুই করে গুণে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে লখিন্দর বলে, 'মোটে পাঁচটা!'

লখিন্দর বলে, 'কী করব, পাখি যে এ বছর ইদিক পানে আসচে না। পাঁচটা ধরতেই আস্ত একটা বেলা কাবার হয়ে গেল।'

নিশিকান্ত বলে, 'আমার যে অনেক পাখি দরকার। কলকাতা থিকে 'অডার' দিয়ে গেচে। শালিক, টিয়া, বুলবুলি, সরাল, ময়না, মাছরাঙা, মুনিয়া, ল্যাজঝোলা আর শীতের পাখি যত পাওয়া যায়—চাই।'

লখিন্দর বলে, 'আমি তো পাখির তরে (জন্য) আকাশের দিকে চক্ষু পেতেই আচি। কিন্তুন না এলে কী করি?'

গিরীন পেছন থেকে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ বড়বাবু, এবেরে পাখির আনাগোনা বড্ড কম।'

নিশিকান্ত বলে, 'কম হলে তো চলবে নি। এত লোকের কাচ থেকে অডার লেওয়া হয়েচে, হাত পেতে অ্যাডভান্স লিয়েচি, পাখি না পেলে চলবে কী করে?'

গিরীন বলে 'অখুনও সময় যায় নি। সবে পোষ মাস পড়ল। দুবছর আগে তো মাঘ কাবার করে শীতের পাখি এয়েছেল, তাই না রে লখা?'

লখিন্দরের মনে পড়ে যায়। সে বলে, 'হ্যাঁ গ গিরীনদাদা। গোটা অঘ্‌ঘান পোষ আর মাঘ হাঁ করে বসে ছিলাম। তারপর পাখিরা এল। ওদের কখন কী মতিগতি হয় কে জানে!'

নিশিকান্ত বলে, 'তা হলে ক'দিন ধৈয্য ধরে থাকা যাক। তুই তা বলে কাজে ঢিল দিস নি। রোজ বিলে যাবি।'

'তা তো যাবই। কিন্তুন পাখি যদি অন্য বচ্ছরের মতো না আসে? সিদিন এট্টা কথা শুনে আমার বুকের ধুকুরপুকুর তো থেমে যাবার জো হয়েছিল।'

'কী কথা?'

'কলকারখানার ধোঁয়ায় নাকিন বাতাস লষ্ট হয়ে যাচ্চে। তাই এদানিং আর পাখপাখালি আসতে চায় না।'

নিশিকান্ত এবং গিরীনের পেটে কিঞ্চিৎ বিদ্যে-টিদ্যে আছে। তারা খবরের কাগজে উপসাগরের যুদ্ধের খবর পড়েছে। নিশিকান্ত বলে, 'শুদু কি কারখানার ধোঁয়া রে, মান্‌ষে বোমা ফাটিয়ে যুদ্ধু করে পিরথিবীর কিচু কি আর রাখচে। সে যাক্‌গ, পাখ্‌ এখেনকার বিলে না আসুক, দশ মাইল দূরে ঝুমরিতলার যে বিল আচে সেখেনে আসতে পারে। সিদিকটাও লজরে রাখিস। আজকের পাখিগুলোন রেখে যা।'

'সি তো রাখতেই হবে।' লখিন্দর বলে, 'ঢের বেলা হয়ে গেল। আজ উঠি বড়বাবু—'

নিশিকান্ত বলে, 'ঠিক আচে, কাল আবার পাখি নে আসিস।'

'আচ্চা—' বলতে বলতে উঠে পড়ে লখিন্দর, কিন্তু গদি-ঘর থেকে তার বেরুবার লক্ষণ দেখা যায় না। মুখটা করুণ করে সমানে হাত কচলাতে থাকে।

নিশিকান্ত শুধোয়, 'কিচু কইবি নাকিন রে?'

'হাঁ—' ভয়ে ভয়ে লখিন্দর বলে, 'ঘরে একদানা চাল লেই গ বড়বাবু। যদিন পনেরোটা ট্যাকা দ্যান—'

'জ্বালিয়ে মারলি—' বলে ডেস্কের দেরাজ থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে লখিন্দরের দিকে ছুঁড়ে দেয় নিশিকান্ত, 'খালি ট্যাকা ট্যাকা আর ট্যাকা! কবে যে শুদবি ভগবান জনে!'

পনেরোটা টাকা পেলে ভাল হত। কিন্তু বাকি পাঁচ টাকা চাইতে আর সাহস হয় না লখিন্দরের। দশ টাকার নোটটা কোমরে গুঁজে পাখি ধরার সরঞ্জামগুলো তুলে নিয়ে সে বেরুতে যাবে, গিরীনের সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে যায়। গিরীন তাকে ইশারা করে। সেটা বুঝতে পারে লখিন্দর, গিরীন তাকে লঞ্চঘাটায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলছে।

## ছয়

লঞ্চঘাটায় আসার পর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না লখিন্দরকে। সে এসেছিল নিশিকান্তর গদি-ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে। আর গিরীন এল আড়তের পেছন দিয়ে শর্টকাটে একটা সরু গলি পেরিয়ে।

এই দুপুরবেলাটা ঘণ্টা দুয়েকের জন্য নদী পারাপার বন্ধ থাকে, তাই লঞ্চঘাটায় ভিড়-টিড় নেই। এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ক'টি প্যাসেঞ্জার অলস ভঙ্গিতে বসে আছে, কখন বেলা পড়লে লঞ্চ চালু হবে সেই আশায়।

একটু নিরালা মতো জায়গায় লখিন্দরকে নিয়ে যায় গিরীন।

লখিন্দর বলে, 'কি বুলবে বুলে ফ্যাল গিরীনদাদা।'

গিরীন বলে, 'দু' বচ্ছর ধরে যা বুলচি তাই বুলব। লতুন কিচু লয়। তুই শাসমলরে ছাড়। তোরে একেকটা পাখির জন্য শাসমল দ্যায় তিন টাকা করে। কলকাতায় সেগুলোন কততে বেচে জানিস? ফি পাখি তিরিশ, চল্লিশ কি পঞ্চাশ। জান দিয়ে খাটলি তুই, আর দুধের সরটা খেলে কে, না শাসমলবাবু। অমন অধম্ম আমি আর সইতে পারচি না।'

সত্যিই এ সব কথা আগেও বহুবার বলেছে গিরীন। সে তার সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে লখিন্দর বলে, 'সবই তো বুঝলাম গিরীনদাদা, কিন্তুন শাসমলবাবু ছাড়ে আমার গতি লেই।'

লখিন্দর যে অসহায়, শাসমলবাবু পাখির দাম যা দেবে তার বেশি চাইবার যে তার সাহস নেই, এ কথা বুঝেও বুঝতে চায় না গিরীন। উত্তেজিত ভাবে সে বলে, 'জানিস এবেরে নিশিবাবু পাখি সাপ্লাই-এর যে অডার পেয়েচে তার জন্যি একেকটা পাখির দাম একশ ট্যাকা করে পাবে। মস্ত বড়লোকরা, সার্কেসওলারা আগাম দিয়ে গেচে। কিচু পাখি নাকিন দিল্লি বোম্বাইতেও যাবে। আর তোর কপালে নবডঙ্কা।'

লখিন্দর চুপ করে থাকে।

গিরীন বলে যায়, 'তোর শরীল ভেঙে পড়চে। কদ্দিন আর খাটতে পারবি? অ্যাখন দু-চারটে পয়সা যদিন না জমাস দুদ্দিনে কে তোকে দেখবে? কী খাবি ত্যাখন?'

লখিন্দর চাঞ্চল্য বোধ করে। বলে, 'তা ঠিক, কিন্তুন শাসমলবাবু যে দর ওটাতে চায় না। বেশি টানা-হ্যাঁচড়া করলে যদিন আমার কাচ থিকে পাখি না লেয়?'

'না লিয়ে যাবে কুথায় ? তোর মতো পাখি-ধরা এ মুল্লুকে আর কে আচে!' গিরীন বলে, 'তুই মোচড় দিলে ট্যাকাটা নিশিবাবু ঠিকই বাড়াবে কিন্তুন কত আর ? দু-পাঁচ ট্যাকার বেশি লয়।'

লখিন্দর শুধোয়, 'তা তুমি কী করতে বুলচ ?'

'আগে যা বুলেচি অ্যাখনও তাই বুলচি। এট্টু ঝুঁকি নে, কলকাতায় চলে যা।'

'ভরসা হয় না।'

'কেন ?'

'কলকাতা পেল্লায় শহর। দু-একবার মোটে গেচি। সেখেনে গিয়ে কার কাচে পাখি বেচব ?'

গিরীন বলে, 'তার এট্টা ব্যবস্থা আমি করে ফেলিচি।'

লখিন্দর উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যবস্থা ?'

আমি তোরে কলকাতার ক'জনার ঠিকানা দিচ্চি। এই সব বাবুরা শাসমলবাবুর কাচ থিকে পাখি কেনে। সার্কেস কোম্পানির ঠিকানাও দেবো। তুই কলকাতায় গে তাদের সন্‌গে দেখা করবি। কাজ হয়ে যাবে। কিন্তুন খবরদার—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় লখিন্দর।

গিরীন বলে, 'খুব গোপনে কলকাতায় যাবি। শাসমলবাবু যেন ট্যার না পায়। আমি যে তোরে ঠিকানা দিয়েচি, গলা কেটে ফেললিও বুলবি না। তাতে তোরও বেপদ, আমারও। হুঁশিয়ার।'

কলকাতায় গিয়ে বড় বড় লোকদের সঙ্গে দেখা করে পাখি সাপ্লাইয়ের অর্ডার আনতে পারলে প্রচুর টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রথমটা খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠে লখিন্দর কিন্তু পরমুহূর্তে যাবতীয় উদ্দীপনা নিভে যায়। লখিন্দর বলে, 'কিন্তুন—'

গিরীন বল, 'কী ?'

'কলকাতায় যে যাব, গাড়ি ভাড়ার পয়সা কুথেকে পাব ? তাছাড়া উই মস্ত শহরটায় গিয়ে তুমার দেওয়া ঠিকানাগুলোন কি খুঁজে বার করতে পারব ?'

গিরীন রেগে যায়। বলে, 'এটা পুরুষ মানুষের মতো কথা হল ? ঠিকানা লিখে দেবো, লোকজনকে দেখিয়ে শুদোতে শুদোতে চলে যাবি। আর ভাড়ার পয়সা ? রেলের ভাড়া তো লাগবে নি।'

অবাক হয়ে লখিন্দর জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

'এখেন থিকে সব্বাই তো বিনি টিকিটে যাওয়া আসা করে। তুইও যাবি।'

'না গ, সিটি আমি পারব নি।'

'এক্কেবারে ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।'

'যুধিষ্ঠির লই গ। আমার ডর লাগে। পুলিশে ধরে যদিন হাজতখানায় পুরে দেয়?'

'ঠিক আচে, ঠিক আচে। তা এক কাজ কর, শাসমলবাবুর কাচ থিকে আর কিচু আগাম চেয়ে নে।'

লখিন্দর চমকে ওঠে, 'না গো, সিটি পারব নি। ফের ট্যাকার কথা বুললে গলা কেইটে ফেলবে।'

একটু চিন্তা করে গিরীন বলে, 'ঠিক আচে। আমি তোরে পঞ্চাশটা ট্যাকা দেবো।'

লখিন্দর বলে, 'আমার মতো ভিখিরের ট্যাকা দিতে চাইচ। কদ্দিনে শুদতে পারব তার কিন্তুন ঠিক লেই।'

'যদ্দিনে পারিস শুদিস। আমি তাগাদা দেবো নি।'

লখিন্দর কী ভেবে বলে, 'তা হলে সাহস করে বুক ঠুকে চইলেই যাই কলকাতায়, কি বল?'

গিরীন বলে, যাবি লিচ্চয় যাবি। কত কষ্ট করে পাখি ধরে আনিস। কলকাতায় গেলে ল্যায্য পয়সা পাবি। এখন চলি রে লখা। অনেকক্ষণ আড়ত থেকে বেইরিচি, আবার খোঁজাখুঁজি শুরু কইরে দেবে। কাল পরশু যিদিন সুবিদে, ট্যাকা আর কলকাতার ঠিকানাগুলোন লিয়ে যাস।

গিরীন আড়তে ফিরে যায় আর লখিন্দর যায় বাঁধের দিকে। দোকান থেকে চাল ডাল কিনে সে বাড়ি ফিরবে।

## সাত

কুলতলি থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সারতে বেলা হেলে যায়। বিলে ঘোরাঘুরি, তাছাড়া গঞ্জে যাওয়া, সেখান থেকে বাড়ি ফেরা—শরীরের ওপর ধকল কম যায় নি। কিন্তু আজ আর জ্বর আসে নি লখিন্দরের। তবে বেশ একটু কাহিল লাগছে।

এখন দাওয়ার একপাশে কাঁথা গায়ে জড়িয়ে ছেঁড়া চাটাইয়ে শুয়ে আকাশের দিকে অলস চোখে তাকিয়ে আছে লখিন্দর।

দাওয়ার আরেকধারে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে পান সাজছে সারী। পানের নেশাটি তার জবর। সারীর হাতের কাছে রয়েছে আলতা, চিরুনি, হাত আয়না, একটা লাল টিপের পাতা। পান খাওয়া হয়ে গেলে সে সাজতে শুরু করবে।

যদিও লখিন্দর ভূষণের কাছে সারীর ব্যাপারে নিস্পৃহ থেকেছে কিন্তু গঞ্জ থেকে ফেরার সময় মনে মনে ভেবে রেখেছিল সারীর কাছে নটবরের আসা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে কিন্তু কিছুই করে নি।

শুধু আজই তো না, অনেক দিন আগেই লখিন্দর টের পেয়েছে নটবর সারীর কাছে আনাগোনা করছে। প্রথম দিকে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল, মাথায় রক্তও চড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পারে ভেবে দেখেছে সারীর কোনো সাধই তো সে মেটাতে পারে নি। শরীরে যখন অসুরের শক্তি ছিল তখনকার কথা আলাদা। তখন প্রাণভরে বউ-এর সাধ মিটিয়েছে, কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার পর সে না দিতে পেরেছে একটা ভাল কাপড়, না দু-একখানা গয়না। কত দিন গেছে পেটভরে খেতেও দিতে পারে নি। ফলে স্ত্রীকে যদি কেউ ফুসলোয়, লোভ দেখায় আর স্ত্রী যদি সেই লোভের ফাঁদে পা দেয়, তাতে দোষারোপ করাটা ঠিক না। ইদানীং স্ত্রীর প্রতি বিতৃষ্ণার পাশাপাশি এক ধরনের সহানুভূতিও বোধ করে সে। সারীর সঙ্গে তার সদ্ভাবও নেই, আবার ঠিক অসদ্ভাবও নয়। ক্রমশ সে এ ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে পড়ছে। দু'জনের কথাবার্তা খুব কমই হয়। সারাদিনে দু-চারটের বেশি তো নয়ই।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লখিন্দর দেখতে পায় কয়েকটা পাখি বাতাস চিরে চিরে দক্ষিণের বাদা আর বিলের দিকে চলেছে। ধীরে ধীরে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসে সে, চোখে মুখে বিচিত্র চনমনে একটা ভাবও ফুটে ওঠে তার। তার অভিজ্ঞ চোখ, দূর থেকেও বুঝতে পারে ওগুলো শীতের পাখি। পৌষ মাস পড়ার পরও তাদের এ অঞ্চলে দেখা যায় নি। তাই নিয়ে ভীষণ উৎকণ্ঠায় ছিল লখিন্দর। না, হতাশ হবার কিছু নেই। বিদেশী পাখিরা দক্ষিণের বাদা এবং বিলকে ভুলে যায় নি। আজ কয়েকটা দেখা যাচ্ছে। দু-চারদিনের ভেতর নিশ্চয়ই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়বে।

হঠাৎ ভেতরে ভেতরে প্রবল এক উত্তেজনা টের পায় লখিন্দর। এবার যখন পাখি আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখন পেটভরে খাওয়া তো জুটবেই, তাছাড়া স্ত্রীর মনস্কামনা পূর্ণ করাও যাবে। নটবরের দিক থেকে তার মন ফিরিয়ে আনতে পারবে লখিন্দর। হঠাৎ সে ডেকে ওঠে, 'হেই গ'—

সারী অবাক হয়ে তাকায়। ইদানীং বেশ কিছু দিন নিজের থেকে লখিন্দর কখনও তাকে ডাকে নি। বলে, 'কী বুলচ?'

'হেই সেবেরে তুই ঝ্যানো (যেন) কী সব গয়নার কথা বুলেচিলি—কানপাশা, নথ, শেতলপাটি হার, এমনি ধারা আরো কী কী?'

সারীর বিস্ময় বাড়ছিলই। সেই সঙ্গে সে বেশ একটু মজাও পায়। মাথাটি কাত করে গালে হাত দিয়ে চোখ কুঁচকে বলে, 'দেবে নাকিন?'

'ধর যদিন দিই—'

'মোহরের ঘড়া পেয়েচ?'

হেসে হেসে লখিন্দর বলে, 'অখুনও পাই নি, তবে পেইয়ে যাব।'

'তাই বুঝিন?' চোখ নাচাতে নাচাতে সারী বলে, 'পেটে ভাত লেই তো পাচায় রেশমি শাড়ি! তা গয়নাগুলো দিচ্চ কবে?'

'হুই দ্যাক—' আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে পাখি দেখাতে দেখাতে লখিন্দর বলে, 'দেকচিস?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সারী বলে, 'অ!'

লখিন্দর বলে, 'অ'র মানে?

'হাজারে হাজারে আকাশের পাখি ধরবে, তারে বেচবে, তারপর তো শেতলপাটি হার, সোনার নাকছাবি, আংটি...এ জন্মে সে হবার নয়।' সারী বলে।

'হবে, এবেরে হবে। তুই দেকে লিস।' বলতে বলতে আচমকা গলার স্বর নামিয়ে দেয় লখিন্দর, 'দু-চারদিনের মধ্যি আমি কলকাতায় যাচ্চি।'

সারী যেন চমকে ওঠে, 'কলকাতায়!'

'হুঁ। কাউরে বুলিস না। কথাটা য্যানো পেটেই থাকে, কাকপক্ষীতে ট্যার না পায়।'

'হটাৎ করে কলকাতায়?'

মিটি মিটি হাসতে হাসতে লখিন্দর বলে, 'মোহরের ঘড়া বুঝলি না?' সেটা রয়েচে সেখেনে।

সারী বলে, 'তাই নাকিন?'

'হাঁ রে হাঁ।' বলে আগের মতোই নিঃশব্দে হাসতে থাকে লখিন্দর।

লোকটা অনেক দিন পর তার সঙ্গে কথা বলছে। ক্রমশ বড় বেশি রহস্যময় হয়ে উঠছে যেন। অবাক চোখে লখিন্দরকে লক্ষ্য করতে থাকে সে।

লখিন্দর এবার বলে, 'তোর তো কলকাতায় যাবার ভারি শখ। ভাবচি তোরেও সন্‌গে নে যাব।'

সারীর বিস্ময় বাড়ছিলই। বিভ্রান্তের মতো সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লখিন্দর ফের বলে ওঠে, 'এবেরে গিয়ে গয়না-টয়না পছন্দ করে আসবি। পরের বার কিনে দেবো।'

সারী বলে, 'সত্যি কইচ!'

'তোরে ছুঁয়ে বুলচি, প্যুরোটো সত্যি। কিন্তুন ফের হুঁইশার করে দিচ্ছি, কারোরে বুলবি না। বুললে সব বানচাল হয়ে যাবে।'

'তা না হয় না বুললাম। কিন্তুন কলকাতায় আমারে নে যেতে চাইচ, রেলভাড়ার ট্যাকা কুথায় পাবে? সেখেনে গিয়ে কিচু খেতি তো হবে। তার অনেক খরচা—'

'এখুন বুলব না। পরে জানতে পারবি।'

'ঠিক আচে, পরেই বুলো।'

লখিন্দর বলে, 'আরেট্টা (আরেকটা) কথা বুলচি—'

সারী জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

একটু চিন্তা করে লখিন্দর বলে, 'না, অখুন না। পরে শুনিস।'

## আট

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিড়ি ফুঁকছিল লখিন্দর। বিড়ির আগুন অন্ধকার ঘরে অগ্নিবিন্দুর মতো জ্বলছে।

গোটা গাঁ জুড়ে এখন নিষুতি। চারদিক নিঝুম, যে যার খেয়ে দেয়ে ঘুমের আরকে ডুবে আছে। শুধু মাঝে মাঝে কোনো গাছের কোটর থেকে প্যাঁচাদের ভৌতিক ডাক ভেসে আসছে। আর শোনা যাচ্ছে একটানা ঝিল্লিস্বর। এ ছাড়া গোটা চরাচরে অন্য কোন শব্দ নেই।

বাইরে গুন গুন করে গাইতে গাইতে গেরস্থালির কিছু কাজ সেরে রাখছে সারী। লখিন্দর তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। সেই আনন্দে বিকেল থেকেই সে বিভোর।

সারীর কাছে নটবর আসে এবং সে তাকে প্রশ্রয় দেয়, এই নিয়ে একেক সময় রাগে উত্তেজনায় মাথায় রক্ত চড়ে যায় লখিন্দরের। কিন্তু আজ কলকাতায় যাবার কথা বলতেই তক্ষুণি রাজী হয়ে গেল সারী। নটবর তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেললে এতটা খুশি সে কিছুতেই হত না। নাঃ, লখিন্দর প্রায়ই যে ভয়টা পায়, সারী তাকে ফেলে পালিয়ে যাবে, দেখা যাচ্ছে সেটা ঠিক নয়। শুধু তার দু-একটা ছোটখাট সাধ মিটিয়ে দিলে সে চিরকাল তারই থেকে যাবে। অনেক দিন বাদে স্ত্রীকে খুব নিজের করে পেয়েছে লখিন্দর। সারী খুশি হওয়ায় সে-ও কম খুশি হয় নি।

বাইরের কাজ সেরে একসময় ঘরে এসে দোর বন্ধ করতে করতে মুখ ফিরিয়ে সারী বলে, 'ঘুমোও নি?'

লখিন্দর মাটির মেঝেতে বিড়িটা ঘযে আগুন নিভিয়ে একধারে ছুঁড়ে দেয়। তারপর বলে, 'না, তুর জন্যি জেগে আচি।'

সারী বিছানায় এসে লখিন্দবের গা ঘেঁযে শুয়ে পড়ে। লখিন্দর তাকে কাছে টেনে নিতে নিতে বলে, 'তুর সাধ কুনোদিন মিটোতে পারি নি। অখুন এট্টা সুযুগ এয়েচে। তুরে আমি ক্যামন করে সাজাই, দেখে লিস।'

সোহাগে লখিন্দরের বুকে মুখ ঘযতে ঘযতে সারী বলে, 'সাজিও, তুমার য্যামন ইচ্চে সাজিও।'

লখিন্দর সারীকে পরম তৃপ্তিতে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কিন্তন—'

'কী?'

'মাঝে মদ্যি আমার বড্ড ডর লাগে রে—'

'কিসের ডর?'

'সাহস করে কইব?'

'আমি তুমার পরিবার, আমারে তুমার ডরটা কিসের?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লখিন্দর বলে, 'আমার সন্গে তুই আর নাকিন থাকবি না।'

সারী চমকে ওঠে, 'তুমারে ই (এই) কথা কে বুলেচে?'

'আমার মন।' সোম্সারটা ভেঙে দে চলে যাস না বউ।' হঠাৎ গভীর আবেগে যেন ভেসে যায় সারী। লখিন্দরের কর্কশ মুখে চুমু খেতে খেতে গাঢ় গলায় বলে, 'তুমারে ছেইড়ে যাব নি গ, কুনোদিন যাব নি।'

## নয়

কুলতলি থেকে সোয়া শ কিলোমিটার দূরে কলকাতার এক নিরিবিলি অভিজাত পাড়ার একটি দোতলা বাড়ির চমৎকার সাজানো গোছানো ড্রইং রুমে বসে আছেন দুই বন্ধু—সোমনা আর হিরণ্ময়। দু'জনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দু'জনেই নাম-করা শিকারী। এই বাড়িটাও সোমনাথদের।

ড্রইং রুমটার দেওয়ালে বাঘের মুণ্ড, হরিণের ছাল ইত্যাদি আটকানো আছে। মেঝের একধারে একটা স্টাফ করা চিতাবাঘ আর বনবিড়াল দাঁড়িয়ে—মনে হয় একেবারে জীবন্ত।

সোমনাথের হাতে একটা ডবল্-ব্যারেল বন্দুক। বন্দুকটার নল পরিস্কার করতে করতে তিনি বলেন, 'গভর্ণমেন্ট যে সব আইনটাইন করেছে তাতে শিকারের মজাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। বন্দুক রেখে আর লাভ নেই।'

হিরণ্ময় বলেন, 'ঠিকই বলেছ। ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজার্ভেসনের নামে বড় বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। আমাদের মতো লোকেদের আর সুখ নেই।'

সোমনাথ বলেন, যা বলেছ। একদিন দেখবে হাতি, বাঘ, গণ্ডারের সংখ্যা মানুষের চেয়ে বেড়ে যাবে। মানুষ হয়ে যাবে মাইনরিটি। দিস ওয়ার্ল্ড উড বী আ হ্যাবিটাট অব অ্যানিমাল্স। জন্তু জানোয়ার ছাড়া আর কিছু থাকবে না।'

'কিন্তু ভাই, এতকাল বন্দুক চালিয়ে চালিয়ে বদভ্যাস হয়ে গেছে। শীত পড়ে গেল। এবার একদিনও শিকার-টিকারে বেরুনো হল না। বন্দুকগুলোতে জং ধরে যাচ্ছে, হাতও নিশপিশ করছে। কিছু একটা ব্যবস্থা কর।'

'লোকের চোখের সামনে তো কিছু করা যাবে না। একদিকে রয়েছে পুলিশ, আরেক দিতে ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারভেসনওলারা। তার ওপর আছে খবরের কাগজ। আমরা বন্দুক নিয়ে কোথাও গেছি টের পেলে অ্যায়সা হৈ চৈ শুরু করে দেবে—'

সোমনাথের কথা শেষ হতে না হতেই হিরণ্ময় বলেন, 'লোকে টের পাবে কেন ? যা করার আমাদের লুকিয়ে-চুরিয়েই করতে হবে।'

একটু চুপ। তারপর সোমনাথ বলেন, 'একটা খবর পেলাম। তবে সেটা কতদূর ঠিক জানি না।'

'কী খবর ?'

'কুলতলি নামে একটা জায়গায় নাকি ফি বছর হাজার হাজার পাখি আসে। ওখানকার খবর নাকি কলকাতার অন্য শিকারীরা পায় নি।'

'কে দিলে তোমাকে খবরটা ?'

'তুমি তো জানো আমার কিছু স্কাউট আছে। কোথায় কী শিকার পাওয়া যায় তারাই জানিয়ে দেয়। এদেরই একজনের কাছে কুলতলির কথা শুনলাম।'

'জায়গাটা কোথায় ?'

'কলকাতা থেকে একশ পঁচিশ কিলোমিটার নর্থ-ইস্টে।'

'গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই কুলতলির কথা জানে ?'

'জানতে পারে। আমার লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে ঠিক বলতে পারল না।'

হিরণ্ময় কিছুটা নিরাশই হয়ে পড়ে। বলে, 'গভর্ণমেণ্ট জানলে নিশ্চয়ই পাখিদের প্রোটেকসানের ব্যবস্থা করবে। অতটা রাস্তা যাওয়া-আসাই তখন সার হবে।'

সোমনাথ বলেন, 'গভর্ণমেণ্ট যদি না-ও জেনে থাকে, ওয়াইল্ড লাইফ প্রিজারর্ভেসনওলাদের দশজোড়া করে চোখ। তারা ডেফিনিট্ খবর পেয়ে গেছে। দুনিয়ার পশুপাখিকে বাঁচিয়ে রাখার সব রেসপনসিবিলিটি নিয়ে বসে আছে ওরা। এই লোকগুলো ঝামেলা বাধিয়ে দেবে।'

হিরণ্ময় বলেন, 'সে ভয় আছে। কিন্তু সারা বছরে দু-একটা পাখি-টাখিও যদি না মারতে পারি, শিকার বিলকুল ভুলে যাব যে।'

'তা হলে কুলতলিতে একটা চান্স নেওয়া যাক, না কি বল ?'

'নট আ ব্যাড আইডিয়া। অনেক দিন কলকাতায় পড়ে আছি। একটা আউটিংও হবে, সেই সঙ্গে হ্যাণ্টিংও—ইফ এভরিথিং গোজ অলরাইট।'

'আমার স্কাউটের কাছে আরো ডিটেলে সব জেনে নিই, তারপর একদিন বেরিয়ে পড়া যাবে।'

'ঠিক আছে।'

## দশ

সূর্য বহুদূরে নদীর বাঁকে জলের নিচে নেমে যাচ্ছে। রক্তাভ আলোয় ভরে যাচ্ছে চারিদিক। কিন্তু কতক্ষণ আর। শীতের বিকেল ফুরিয়ে গিয়ে ঝপ করে কুলতলির ওপর নেমে আসবে সন্ধ্যা।

এই মুহূর্তে নদীর বাঁধের ধার দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছে গিরীন আর লখিন্দর। লখিন্দর বলে, 'পঞ্চাশটা ট্যাকা তুমি দিলে কিন্তুন শাসমল বাবু তো এট্টা ফুটো আধলাও ঠেকালে না। এই ট্যাকায় কলকাতায় যাওয়া যাবে নি।'

গিরীন বলে, 'মুশকিলের কথা। কিন্তুন পঞ্চাশের বেশি দেবার খেমতা (ক্ষমতা) আমার নেই। আর কুথা থিকে জোগাড় করতে পারবি নি?'

'আমার মতো হাভাতেকে ভরসা করে কে ধার দেবে বল?'

'তবু চেষ্টা করে দ্যাখ।'

লখিন্দর উত্তর দেয় না।

গিরীন একটু চিন্তা করে বলে, 'এক কাজ কর। কষ্ট করে কুনো রকমে কলকাতায় চলে যা। ক'টা পাখি ধরে নে যাস। কলকাতায় তাদের সন্‌গে দেখা করবি, ওরা ঠিক পাখিগুলোন কিনে লেবে। ত্যাখন আর ট্যাকার চিন্তা থাকবে নি।'

লখিন্দর বলে, 'যদিন না কেনে?'

গিরীন ভরসা দিয়ে বলে, 'আরে বাপু, ঠিক কিনবে। পাখির তরে কলকাতার লোকেরা মুকিয়ে (মুখিয়ে) আচে।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যেতে ব্যস্তভাবে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে লখিন্দরকে দিতে দিতে বলে, 'তোরে কলকাতার ঠিকানাগুলোনই দেওয়া হয় নি। এই নে—হারাস নি য্যান, যত্ন করে রাখিস।'

লখিন্দর বলে, 'হারাই কখুনো! হারালে কলকাতায় যাওযাই মাটি।'

গিরীনের কাছ থেকে টাকা আর কলকাতার ঠিকানাগুলো নেবার পর ক'দিন বিলে এবং বাদায় পাখির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লখিন্দর। যথারীতি ভূষণও তার সঙ্গে রয়েছে।

সেদিন বিকেলে দু-চারটে শীতের পাখি আসতে দেখেছিল লখিন্দর। তার আশা ছিল, একবার যখন আসতে শুরু করেছে তখন আর চিন্তা নেই। এবার তারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে। কিন্তু তিন চার দিন কেটে গেছে, আর পাখি আসার নাম নেই। যা দু-একটা এসে পড়েছে তারা এখানকার বিলে নামে নি, কোথায় যে উধাও হয়েছে কে জানে!

এই ক'দিন দু'জনে মেটে আলু, কচ্ছপ আর কিছু শাক-পাতা ছাড়া কিছুই জোগাড় করতে পারে নি।

গিরীন পরামর্শটা ভালই দিয়েছিল। ক'টা পাখি ধরে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারলে ভালই হত। কিন্তু বিদেশী শীতের পাখির কথা না হয় বাদই দেওয়া হল, এ অঞ্চলের চেনা পাখি যেমন শালিক, বুনো টিয়া, ময়না বা চড়ুইও ধরা যায় নি। সেগুলো গাছের মাথায় লখিন্দরের নাগালের বাইরে ওড়াউড়ি করেছে। ওদের গলা নকল করে হাজার ডাকাডাকি করেও নিচে নামানো যায় নি।

আজ বিল থেকে বিকেল নাগাদ ফিরে এসে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘরের দাওয়ায় পাখি ধরার সরঞ্জামগুলো রেখে একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে পড়ে লখিন্দর। মনটা তার ভীষণ দমে গেছে। এবার পাখিদের যা মতিগতি তাতে কলকাতায় যাওয়া না-যাওয়া সমান। পাখি যদি ধরতে না পরি কলকাতার বাবুদের কাছ থেকে অর্ডার এনে কী লাভ ?

সারী দাওয়ার আরেক ধারে বসে একটা হাত-আয়না মুখের সামনে ধরে পরিপাটি করে দুই ভুরুর মাঝখানে টিপ পরছিল। আয়নায় চোখ রেখেই বলে, 'আজও পাখি পেলে না ?'

লখিন্দর বিমর্ষ মুখে বলে, 'না। ক'দিন ধরে বিলে ঘোরাই সার। পাখিগুলোন এ বছর বড্ড ত্যাঁদড়ামো করচে।'

সারী আয়নাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে বলে, 'তা হলে ?'

'ভাবচি কলকাতায় যাব না।'

'যাবে না !'

'পাখির জন্যিই তো যাওয়া। তা সেই পাখিই যদিন না ধরতে পারি, গিয়ে লাভ কী।'

কলকাতায় যাওয়া হবে—এই আনন্দে আর উত্তেজনায় ক'দিন ধরে টগবগ করে ফুটছে সারী। সে বলে, 'আসবে আসবে, পাখি ঠিক এইসে পড়বে। চিন্তা করো নি।'

স্ত্রীর এতটা আশাবাদেও উদ্দীপ্ত হতে দেখা যায় না লখিন্দরকে! সে বলে, 'তা ছাড়া, গিরীন মোট্টে পঞ্চাশটা ট্যাকা ধার দিলে। উই ট্যাকায় কি দু'জনার কলকাতায় যাওয়া হয়! ক'টা পাখি পেলেও না হয় কথা ছিল।' একটু থেমে বলে, 'কলকাতার আশা ছাড়ান দে।'

সারী বেশ ঝাঁঝের গলায় বলে, 'কলকাতায় যাব কত আশা করে বসে আচি। সেই আশাটায় জল ঢেইলে দেবে! ক্যামন পুরুষ গ তুমি! বৌয়ের এট্টা সাধ মিটোতে পার না!'

লখিন্দর কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'কী করব? ভগবান সব দিক থিকে আমারে মেইরে রেকেচে, গরীব কইরে পিরথিবীতে পেটিয়েচে (পাঠিয়েছে)। তার ওপর দু দু'টো বচ্ছর ব্যারামে কাবু করে রাখলে। সাধ মিটবে কুত্থেকে? তুই লিজে বিবেচনা কইরে দ্যাখ।'

সারী বলে, 'চেরটা কাল তো ওই এক কথাই শুনচি—গরীব, গরীব আর গরীব। ঠিক আচে, আমি তুমাকে ক'টা ট্যাকা দিচ্চি। আমাকে কলকাতায় নে যেতেই হবে।'

লখিন্দর অবাক হয়ে বলে, 'তুই ট্যাকা পাবি কুত্থেকে?'

উত্তর না দিয়ে সারী ঘরের ভেতর চলে যায়। চালের বাতা থেকে বাঁশের বড় একটা খণ্ড বার করে আনে। খণ্ডটার দুই গাঁটের মাঝখানে টাকা পয়সা রাখার জন্যে ফুটো রয়েছে।

বারান্দায় ফিরে এসে বাঁশের খণ্ডটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে প্রচুর রেজগি আর নোট বার করে সারী। সেগুলো গুনি সাজাতে সাজাতে বলে, 'সব মিলে দু'শ বার ট্যাকা তিরিশ পয়সা।'

লখিন্দরের মাথায় বিজলী চমকে যায়। সে বুঝতে পারছিল এই টাকাগুলো সারী পেয়েছে নটবরের কাছ থেকে। প্রণয়ীর উপহার। তবু খাড়া হয়ে বসে তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'এত ট্যাকা পেলি কুথায়, কে দিলে?'

সারী বলে, 'সে খপরে তুমার দরকার কী? দিচ্চি, লিয়ে লাও।'

লখিন্দর কী বলবে ভেবে পায় না। ভেতরে ভেতরে একটা জ্বালা বোধ করতে থাকে শুধু।

সারী ফের বলে, 'কলকাতা গে যদিন জেবনে (জীবনে) দেঁড়াতে পার, তাই ট্যাকাগুলোন তুমারে দিলাম।'

প্রথম দিকে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, পরক্ষণে এই ভেবে সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে যে সারী পরপুরুষের দিকে ঝুকেছে ঠিকই কিন্তু তাকেও মেয়েমানুষটা ভালই বাসে, নইলে টাকাগুলো বার করে দেবে কেন?

লখিন্দর বলে, 'হাঁ, তুলে কুনোদিন সুখ দিতে পারি নি। দেখি কলকাতায় গিয়ে যদিন বরাত ফেরানোর ব্যবস্তা করতে পারি।'

## এগারো

আজ সকালে সারীকে নিয়ে লখিন্দর কলকাতায় চলেছে। সারীর পরনে ডুরে-কাটা হলুদ শাড়ি, লাল ব্লাউজ। তার ওপর পুরনো গরম চাদর।

সারী আজ ভাল করেই সাজগোজ করেছে। তার মাথায় টান করে বাঁধা খোঁপা, খোঁপার চারধারে রুপোর ফুলওলা কাঁটা গোঁজা। দু'হাতে গোছা গোছা কাচের চুড়ি। নাকে ঝুটো পাথর বসানো নাকফুল, কানে রুপোর মাকড়ি। আলতা-পরা পায়ে শস্তা চটি।

লখিন্দরও দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে পরিস্কার ধুতি আর জামা পরেছে, তার ওপর পোকায় কাটা পুল-ওভার। অনেক কালের পুরনো একজোড়া জুতো ছিল, সে দুটো সারিয়ে নিয়ে পায়ে গলিয়েছে। মাথায় প্রচুর তেল মাখার ফলে জুলফি বেয়ে অল্প অল্প চুঁইয়ে পড়ছে।

ঘরে তালা লাগিয়ে খাল পেরিয়ে ওপারে যেতেই গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

ভূষণদের বাড়ি ডাইনে রেখে খানিক এগুলে সনাতন ধাড়ার বাড়ি। আধবুড়ো সনাতন তার ঘরের দাওয়ায় বসে একটা পুরনো মাছ ধরা জাল মেরামত করছিল। মুখ তুলে সে শুধোয়, 'অত সেজেগুজে কুথায় চললি রে লখা?'

লখিন্দর এবং সারী আগেই ঠিক করে নিয়েছিল, কলকাতায় যাবার ব্যাপারটা গোপন রাখবে। খবরটা চাউর হোক, এটা তাদের পক্ষে একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। পাঁচ কান হয়ে যদি কোনোভাবে শাসমলবাবুর কানে ওঠে, ঘোর বিপদ। ঘোড়া ডিঙিয়ে তারা ঘাস খেতে যাচ্ছে, এটা জানলে শাসমলবাবু ক্ষেপে উঠবে।

লখিন্দরের মিথ্যে বলার অভ্যাস নেই। চোখ কান বুজে সে একরকম মরিয়া হয়েই বলে ওঠে, 'এই এট্টু শ্বউর বাড়ি যাচ্ছি গ কাকা। অনেক দিন যাওয়া হয় নি, তাই—'

সনাতন বলে, 'হটাৎ শ্বউর বাড়ি?'

'এই শাউড়ির শরীলটা ভাল লয়। তাকে দেকতে যাচ্ছি।'

'কী হয়েচে?'

বরাবর লখিন্দর লক্ষ্য করেছে, সনাতন লোকটা বড় বেশি কথা বলে। তার কৌতূহল মারাত্মক। লোকটার স্বভাব হল, পরের হাঁড়ির খবর টেনে বার করা।

মিথ্যের পর মিথ্যে চালিয়ে যাবার মতো উদ্ভাবনী শক্তি লখিন্দরের নেই। তবু চোখ কান বুজে সে বলে ফেলে, 'ক'দিন ধরে ধুম জ্বর।' তারপর সনাতনকে আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে বলে, 'চলি গ কাকা। আর দেরি করলে টেরেন (ট্রেন) ধরতে পারব নি।' বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়।

রাস্তায় আরো ক'জনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাদেরও এক প্রশ্ন। কোথায় যাচ্ছে লখিন্দররা, কেন যাচ্ছে, ইত্যাদি। সনাতনকে লখিন্দর যা বলেছিল, এই লোকগুলোকেও তাই বলে যায়।

গাঁয়ের শেষ মাথায় আসতে দেখা যায় উল্টো দিক থেকে কয়েকটি যুবতী আর মাঝবয়সী মেয়েমানুষ মাথায় করে শুকনো কাঠকুটরো বয়ে নিয়ে আসছে। তারা অবশ্য কিছুই জিজ্ঞেস করে না। লখিন্দর জানে এই মেয়েমানুষগুলো সারীর স্বভাবচরিত্রের জন্যে তাকে ভীষণ ঘেন্না করে। ওরা মুখ বাঁকিয়ে, সারীর ছোঁয়া বাঁচিয়ে অন্য দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যায়।

গাঁয়ের সীমানা ছাড়াবার পর পথ একেবারে সুনশান। কোথাও লোকজন চোখে পড়ে না।

সারী বলে, 'যাক বাবা, বাঁচা গেল।'

লখিন্দর মাথা নাড়ে, 'হুঁ'—

সারী বলে, 'কুথায় যাচ্চি কেন যাচ্চি, হাজারটা কৈফোৎ (কৈফিয়ৎ) দাও। কেন রে বাপু, তুদের অত খোঁজে দরকারটা কী?'

'যা বুলেচিস।'

ফাঁকা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় কুলতলি গঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছে যায় লখিন্দররা।

রেল স্টেশনে যেতে হলে গঞ্জের ভেতর দিয়ে সোজাসুজি একটা রাস্তা আছে। কিন্তু সেখানে গেলে শাসমলবাবুর চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। সেটা আদৌ সুখকর নয়। আরেকটা ভাবেও যাওয়া যায়। গঞ্জের পেছন দিয়ে ফসল-কাটা মাঠ পেরিয়ে অনেকটা ঘুরপথে। তাতে সময় বেশি লাগে।

লখিন্দর স্ত্রীকে নিয়ে মাঠ বরাবর হেঁটে স্টেশনে চলে আসে। প্ল্যাটফর্মের নির্জন কোণে নিয়ে সারীকে বলে, 'তুই এখেনে বস। আমি টিকিটটা কেটে আনি।'

সারী জিজ্ঞেস করে, 'কখুন ফিরবে?'

'যাব আর আসব। টিকিট কাটতে কতক্ষণ আর লাগে।'

লখিন্দর টিকিট ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ দূরে হরেনকে দেখতে পায়। হরেন শাসমলবাবুদের আড়তে ধান-চাল মাপে। নাঃ, অনেকটা ঘুরে স্টেশনে এলেও দেখা যাচ্ছে সে নিরাপদ নয়। তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে উল্টোদিকে হাঁটতে থাকে লখিন্দর। হরেনের মুখোমুখি হওয়াটা কাজের কথা নয়। কেন পরিস্কার জামাকাপড় গায়ে দিয়ে সে স্টেশনে এসেছে, এমন নানা প্রশ্ন করে করে হরেন তার জেরবার করে ছাড়বে। তারপর যদি টের পায় সারীও তার সঙ্গে এসেছে, তাহলে তো কথাই নেই। কৌতূহল মিটিয়েই যে হরেন থেমে যাবে তা তো নয়, আড়তে ফিরে সরাসরি শাসমলবাবুকে তাদের কথা সাতকাহন করে লাগাবে।

প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় গিয়ে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আড়ে আড়ে তাকিয়ে লখিন্দর যখন দেখল হরেন স্টেশন চত্বরের কোথাও নেই তখন আস্তে আস্তে টিকিট ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু আজ বুঝি ঘোর অযাত্রায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে লখিন্দর। একের পর এক ঝঞ্ঝাট এসে দাঁড়াচ্ছে সামনে। টিকিট কেটে সে সবে বেরিয়ে এসেছে, কলকাতা থেকে একটা ট্রেন হুড়মুড় করে এসে পড়ে। কুলতলি এ অঞ্চলের শেষ স্টেশন।

ট্রেনের কামরা ফাঁকা করে দিয়ে বেশ কিছু লোকজন নামে। অন্যমনস্কর মতো ভিড়ের ভেতর দিয়ে প্ল্যাটফর্মের আরেক প্রান্তে যেখানে সারী বসে আছে, সেদিকে যাচ্ছিল লখিন্দর। হঠাৎ তার কাঁধে কার যেন হাত এসে পড়ে। চমকে ঘুরে তাকাতেই দেখতে পায় নটবর। লোকটা বোধ হয় কলকাতায় গিয়েছিল, এখন ফিরছে।

নটবর দাঁত বার করে শুধোয়, 'কুথায় চললে গ?'

লখিন্দর হকচকিয়ে যায়। তারপর খানিক ধাতস্থ হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবার কথা বলে।

নটবর জিজ্ঞেস করে, 'কুথায় তুমার শ্বউরের ঘর?'

'চিংড়িহাটায়।'

'একলাই চললে নাকিন?' বলে চনমন করে চারিদিকে তাকাতে থাকে নটবর।

লখিন্দর মনে মনে চোদ্দপুরুষ তুলে নটবরকে গালাগাল দিতে দিতে বলে, 'শালো শ্যাল (শেয়াল), তুমি কারে খুঁজতেচ তা কি আমি বুঝি না?'

তার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাগাড় দিয়ে ওঠে। মুখে বলে, 'হ্যাঁ, একলাই যাচ্ছি।'

প্রচণ্ড উৎসাহের সুরে নটবর বলে, 'ক'দিন থাকচ শ্বউর বাড়িতে?'

লখিন্দর বলে, 'এক বচ্ছর পর যাচ্ছি, দু-চার দিনের আগে কি আর ওরা ছাড়বে?'

চোখ দুটো অন্তর্নিহিত লোভে চকচকিয়ে ওঠে নটবরের। সে বলে, 'সি তো বটেই, জামাই বুলে কথা!'

লখিন্দর এমনিতে সাদাসিধে উদাসীন ধরনের মানুষ কিন্তু এই মুহূর্তে নটবরের সঙ্গে ফিচলেমি করতে ভীষণ ইচ্ছা হয়। নিপাট ভালমানুষের মতো মুখ করে সে বলে, 'এই দু-চারটে দিন বৌটা একা একা থাকবে।'

লখিন্দরের মনোভাব বুঝতে পারে না নটবর। সে শশব্যস্তে বলে ওঠে, 'আচ্ছা, তা হলে শ্বউরের ঘরে আনন্দ করে এসো। আমি চলি—'

নটবরের যেন তর সইছে না, এমন ভঙ্গি করে সে চলে যায়।

লখিন্দর মনে মনে খুব একচোট হেসে নিয়ে বিড় বিড় করে 'শ্যালো, গুখেকোর ব্যাটা, যাও, আমার ঘরে যেয়ে বুড়ো আঙুল চোষো গে।'

বলে আস্তে আস্তে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দেয়।

# বারো

সারীর কাছে আসতেই সে উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কি গ, টিকিট কাটতে যে এত দেরি করলে?'

নটবরের নামটা মুখে এসে যাচ্ছিল, কোনো রকমে সামলে নিয়ে লখিন্দর বলে, 'এই একজনার সন্‌গে দেখা হয়ে গেল, দাঁড় কইরে দু-চারটে কথা বুললে। তাই—তাড়া দিয়ে বলে, 'নে, চটপট গাড়িতে উটে (উঠে) পড়। আবার কোন শ্যালোর সন্‌গে দেখা হয়ে যাবে—'

সামনের একটা কামরায় উঠে দু'জনে। প্ল্যাটফর্মের দিকের সীটে তারা বসে না, উল্টো দিকে জানালার ধার ঘেঁষে মুখোমুখি বসে পড়ে। লোকচক্ষুর আড়ালে যতটা থাকা যায়। আবার কে তাদের দেখে ফেলবে, তখন দাও সাত সতের কৈফিয়ৎ। এখন পর্যন্ত যাদের সঙ্গেই দেখা হয়েছে শ্বশুর বাড়ির নাম করে পার পাওয়া গেছে, কিন্তু একনাগাড়ে মিথ্যে চালিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই লখিন্দরের। মুখ ফসকে কারো কাছে যদি কলকাতার যাবার ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ে, সে যে শাসমলবাবুর কানে সেটি তুলে দেবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সাবধানের মা মার নেই, এই কথাটা ভালই বোঝে লখিন্দর।

নটবরকে নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। লখিন্দরের শ্বশুর বাড়ি যাবার কথাটা সে বিশ্বাস করে নিয়েছে। তা ছাড়া 'কলকাতায় যাচ্চি' বললেও নটবর শাসমলবাবুকে লাগাতে যেত না, কেননা দু'জনের মধ্যে সদ্ভাব নেই, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না।

আধ ঘণ্টা পর ট্রেন ছেড়ে দেয়।

লখিন্দররা ওঠার পর কামরাটা বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। চারপাশে প্রচুর লোকজন। তাদের টুকরো টুকরো কথা কানে ভেসে আসছে লখিন্দরের। কিন্তু তার এবং সারীর চোখ জানালার বাইরে। পলকহীন চলমান টেলিগ্রাফের পোস্ট, গাছপালা, শীতের ফাঁকা মাঠ আর দূরে দূরে অস্পষ্ট গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনে। বহুকাল বাদে রেলগাড়িতে চেপে এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করছে তারা।

এদিকে কামরার ভেতর একজন অন্ধ একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে, গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করছে। তা ছাড়া রয়েছে গণ্ডা গণ্ডা ফেরিওলা। বিচিত্র সুরে তারা চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'লিন তাজা চানাচুর', কিংবা 'গরম

সিঙাড়া, জিলিপি', অথবা 'ঝালমুড়ি'—নানারকম খাদ্যের সঙ্গে সেফটিপিন, ছুঁচ থেকে শুরু করে ব্রতকথার বই, লক্ষ্মীর পাঁচালি, প্লাস্টিকের খেলনা, হজমী গুলি, এমনি হাজার রকমের জিনিস।

হঠাৎ কামরার সব আওয়াজ ছাপিয়ে কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ গলায় 'শুনুন বাবুমশায়রা—' শব্দ দুটো কানে আসতেই জানালার বাইরে থেকে মুখ ফেরায় লখিন্দর আর সারী। অমন বিদঘুটে কণ্ঠস্বরের অধিকারী একটা মাঝবয়সী রোগা শুটকো চেহারার লোক। তার গায়ে মাংসের চেয়ে হাড় বেশি। গাল তোবড়ানো, কোমর তেউরে গেছে। পরনে ময়লী ধুতির ওপর তালিমারা জামা, তার ওপর পোকায় কাটা সোয়েটার। কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা।

ভিড়ের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে আসতে লোকটা হোঁচট খেয়ে উপুর হয়ে পড়ার এমন একটা ভঙ্গী করে যে কামরাসুদ্ধ সবাই হেসে ওঠে।

যেন কতই না লেগেছে, চোখেমুখে এমন এক কাতর অভিব্যক্তি ফুটিয়ে লোকটা বলে ওঠে, 'আমি ব্যথা পেলাম আর আপনারা হাসচেন।'

লোকটার বলার সুরে এমন মজা রয়েছে, যে প্যাসেঞ্জাররা ফের হেসে ওঠে। লোকটা করুণ মুখ করে বলে, 'আপনাদিগের হাসি দেখে আমার কিন্তুন ভারি কষ্ট হচ্চে বাবুমশায়রা।'

ভিড়ের ভেতর থেকে দু-চারজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শুধোয়, 'কেন, কষ্ট কেন?'

'আপনাদিগের সব্বার দাঁত খারাপ। পোকায় কারো দাঁতের সব্বোনাশ কইরে দেছে। কারো মাড়িতে ঘা। জানেন কি, খারাপ দাঁত থেকে সব্ব রোগের উৎপত্তি। একশ বচ্ছর যদি পরমায়ু পেতে চান তো দাঁতগুলো সাইরে (সারিয়ে) লিন।'

সবার হাসি থেমে গিয়েছিল। সমস্বরে তারা জিজ্ঞেস করে, 'কিভাবে?'

লোকটা এবার তার ঝোলা থেকে একটা প্যাকেট বার করে ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখাতে দেখাতে বলে, 'এই যে 'শক্তিমান আয়ুর্বেদ মাজন'। এই মাজন ব্যবহার করলে আপনার দাঁত লোহার মতো শক্ত হয়ে যাবে, কুড়ুল মেরেও নড়ানো যাবে না। দাঁতের পরমায়ু বাড়াতে কিনুন 'শক্তিমান আয়ুর্বেদ মাজন।' এক প্যাকেট পঁচাত্তর পয়সা। একসঙ্গে তিন প্যাকেট দু'টাকা। কিনুন, পরীক্ষা করুন। এমন সুযুগ আর দু'বার আসবে নি।'

একজন মোটা গলায় বলে ওঠে, 'ওরে গুয়ের ব্যাটা, মাজন বেচার ভাল ফন্দি বার করেচ তো। তা দাও এক প্যাকিট।'

কেনাকাটার ব্যাপারটা অনেকখানি ছোঁয়াচে রোগের মতো। কেউ একজন কিনলে দেখাদেখি অনেকেই হামলে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিশ প্যাকেট 'শক্তিমান আয়ুর্বেদ মাজন' বিক্রি হয়ে যায়।

লখিন্দররা অবশ্য কিনল না, আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকাল।

ট্রেনটা দেখতে দেখতে পাঁচ-ছটা স্টেশন পেরিয়ে যায়। কলকাতা যত কাছে এগিয়ে আসছে ততই উত্তেজনা বেড়ে চলছে সারীর। সে বলে, 'আমার অ্যাদ্দিনের সাধটা মিটতে যাচ্চে গ'।

আকাশের দিকে চোখ ছিল লখিন্দরের। শুধু এখনই না, যেদিন থেকে পাখি ধরতে শুরু করেছে নিজের অজান্তেই তার নজর আকাশে চলে যায়। অন্যমনস্কর মতো সে বলে, 'হুঁ।'

'কলকাতা ভাল লাগলে দু-একদিন থেকে আসব কিন্তুন।'

'থাকবি কুথায়? সেখেনে কি আমার শ্বশুরের বাড়িঘর আচে যে থাকতে দেবে?'

'কেন, অত বড় শহরে ধম্মোশালা লেই? শুনিচি ওকেনে পেল্লায় পেল্লায় বাড়ি রয়চে। আমাদের থাকার জন্যি এট্টুখানি জায়গা হবে নি?'

লখিন্দর উত্তর দেয় না, নিবিষ্ট হয়ে আকাশ দেখতে থাকে।

সারী এবার একটু অসহিষ্ণু বলে, 'আরে বাপু, বাড়ির লোকেদের হাতে-পায়ে ধরে বুলব, দয়া কইরে থাকতে দ্যান। আমার কুনো খেতি করব না, চোর চোট্টা লই। খেতিও চাইব না। দেখো, ঠিক থাকতে দেবে।'

দূরমনস্কর মতো লখিন্দর বলে, 'দিলিন (দিলে) ভাল।'

'না যদিন দ্যায়, রাস্তা আচে, গাচতলা আচে। এট্টা ব্যবস্থা ঠিক হইয়ে যাবে।'

'আগে তো কলকাতায় পৌঁছুই, তারপরে তো থাকার কথা।'

বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে লখিন্দর। হঠাৎ দেখতে পায় কয়েক ঝাঁক পাখি আকাশ পাড়ি দিয়ে কুলতলির দিকে চলেছে। আঙুল বাড়িয়ে উদ্দীপ্ত মুখে সে বলে, 'হুই দ্যাখ—'

সারী জানালার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ায়। বলে, 'হুঁ, পাখি—'

'একটা দুটো নয় রে, শ'য়ে শ'য়ে। ভগবান মুখ তুলে চেয়েচে। কলকাতা থিকে ঘুরে আসি—ত্যাখন দেখিস, আমাদের জেবনে দুঃখু আর থাকবে নি। যা চাইবি—'

এবার দেরিতে হলেও ক'দিন ধরে ছুটকো-ছাটকা দু-একটা করে যেই পাখি আসতে শুরু করেছে, লখিন্দরও সুখের দিনের স্বপ্ন দেখছে আর সেই স্বপ্নের কথাটা সাতকাহন করে বলে যাচ্ছে।

সারী উত্তর দেয় না। লখিন্দরের মতো সে-ও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

## তেরো

কুলতলিতে ট্রেনে ওঠার পর ক'টা স্টেশন পার হয়ে গেছে খেয়াল নেই লখিন্দরের। এর ভেতর কামরাগুলো প্রায় ফাঁকা করে দিয়ে অনেক প্যাসেঞ্জার নেমে গেছে।

হঠাৎ একটা স্টেশনে গাড়ি ঢুকতে তুমুল হৈ চৈ শোনা যায়। চমকে আকাশ থেকে চোখ নামাতেই লখিন্দর দেখতে পায়, প্ল্যাটফর্মে প্রচুর লোকজন বসে আছে। সবাই এ অঞ্চলের গরীব গুর্বো গরীব মানুষ। ওদের সঙ্গে প্যান্টশার্ট-পরা শহুরে কিছু লোকও রয়েছে। তাদের হাতে লাল আর কালো কালিতে লেখা বহু পোস্টার আর ছোট ছোট ফ্ল্যাগ। গাড়ি থামতেই তারা তাড়া লাগায়, 'এই উঠে পড় সব—তাড়াতাড়ি। এক্ষুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে।'

গাঁয়ের লোকগুলো হুড়মুড় করে যে যে-কামরায় পারে উঠে পড়ে। তারপর ট্রেন আবার চলতে শুরু করে।

লখিন্দরদের কামরাতেও পঁচিশ তিরিশজন উঠেছিল। তাদের সঙ্গে জনা দুই শহরের বাবু। বাবুরা বসেছে উঁচু সীটে ; নিচে লোহার পাত-বসানো মেঝেতে বসেছে গেঁয়ো মানুষগুলো।

একজন বাবু সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'হাওড়ায় পৌঁছে কেউ হুটপাট করবে না, এদিক ওদিক যাবে না, সবাই একসঙ্গে থাকবে। ওখানে অনবরত ট্রেন আসে, হাজার হাজার লোকের ভিড়। হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা যাবে না কিন্তু।'

নিচের জনতা থেকে একজন বলে ওঠে, 'না না বাবু, আমরা সবাই একসনগে থাকব।'

আরেকজন শুধোয়, 'কলকাতাটা ভাল করে দেখা যাবে তো?' হাওড়ার পোল দেখার বড্ড সাধ গ বাবু—'

বাবুটি বলে, 'হাওড়ার পুলের ওপর দিয়ে তো যাবই। স্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখতে পাবে। আর যে কাজে যাচ্ছ সেটা সারা হলে যত ইচ্ছে কলকাতা দেখো।'

লখিন্দর আর সারী খুব মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিল। সারী নিচু গলায় লখিন্দরকে বলে, 'আমাদের মতো উরাও কলকাতা দেখতে যাচ্চে গ।'

লখিন্দর বলে, 'তা যাচ্চে, কিন্তুন অন্য কাজও আচে ওদের।'

'কী কাজ শুদোও না।'

'কী দরকার?'

এরপর একের পর এক স্টেশন ট্রেন থামে আর ফ্ল্যাগ আর পোস্টার হাতে শহুরে বাবুরা আগের মতোই অগুনতি গেঁয়ো লোককে তাড়া দিয়ে গাড়িতে তোলে।

তিন চারটে স্টেশন যেতে না যেতেই পুরো ট্রেনটা বোঝাই হয়ে যায়। লখিন্দরের কামরাটায় এখন আর পা ফেলার জায়গা নেই। সবগুলো সীটে গাদাগাদি করে লোক বসেচে, নিচেও থিকথিকে ভিড়।

প্রতিটি স্টেশন থেকে এত যে লোক উঠছে তাদের গন্তব্য যে কলকাতা, সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। তবে কলকাতা যাত্রার উদ্দেশ্যটা কী, তা এখনও জানা যায় নি। লখিন্দর প্রথম দিকে নির্লিপ্ত থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্রমাগত লোক ওঠায় তার রীতিমত কৌতূহল হতে থাকে। তার গা ঘেঁষে ক্ষয়াটে খি-ওড়া চেহারার মাঝবয়সী একটা লোক পা তুলে উবু হয়ে বসে ছিল। তার পরনে আধময়লা ঠেটি ধুতি আর ফতুয়া। মাথায় তেলহীন রুক্ষ কাঁচাপাকা চুল, গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। বারকয়েক চোখের কোণ দিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে করতে একসময় ঢোক গিলে লখিন্দর চাপা গলায় ফিস ফিস করে ডাকে, 'হেই গ দাদা—'

লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়, 'কিচু কইচ?'

'হ্যাঁ। তুমরা অ্যাত লোকজন কলকাতায় কী করতে যাচ্চ?'

'মীটিন আচে। লেতারা বক্তিতা দেবে। আমরা সব্বাই শুনব।'

লখিন্দর একটু অবাক হয়। মাইলের পর মাইল বাদা, আকাশ, পাখি, বিল—এই হল তার জগৎ সংসার। ক'বছর ধরে এর মধ্যেই সে ডুবে

আছে। তবু কলকাতার বাবুরা যে মীটিং করার জন্য গাঁ-গঞ্জ ঝেঁটিয়ে লোক নিয়ে যায়, এ খবরটা তার কানেও ভাসা ভাসা ভাবে এসেছে। লখিন্দর বলে, 'মীটিং শোনার জন্যি অ্যাত পয়সা খরচা করে তুমরা কলকাতায় যাচ্চ?'

লোকটা ভুরু ওপর দিকে খানিকটা তুলে জিজ্ঞেস করে, 'কিসির খরচার কতা বুলচ (বলছ)?'

'এই টিকিট কেটে কলকাতায় যাওয়া, সেখেন থিকে ফেরা, তার ওপর খাই খরচা—'

লোকটা বুঝিবা লখিন্দরের মতো আনাড়ি অজ্ঞ মানুষ আগে আর কখনও দেখে নি। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সে বলে, 'টিকিট কেটে কে করে কলকাতায় মীটিন করতে গেচে! অমন কথা বাপের জন্মে শুনি লাই গ।'

লখিন্দর জিজ্ঞেস করে, 'তবে?'

'যাওয়া মাগনা, ফেরাও মাগনা। আর খাওয়া? তা যে পাট্টির (পার্টির) বাবুরা কলকাতায় লিয়ে যাবে, তারাই খাওয়াবে।'

এই খবরটা লখিন্দরের কাছে একেবারে নতুন। চোখ বড় বড় করে সে বলে, 'মাগনায় খেতেও দ্যায়?'

লোকটা বলে, 'দেবে নি?' ঘরসোমসার, হাতের কাজকম্ম ফেইলে মীটিনে যাব, আর খাব কিনা নিজের ট্যাঁকের পয়সা খরচা করে—তাই কখুনও হয় নাকিন?'

'এর আগেও তুমি কলকাতার মীটিনে এসেচ?'

'কতবার এসিচি তার কি হিসেব আচে। কলকাতার দু'-দশ দিন পর পরই হয় এ পাট্টি, লইলে ও পাট্টি মীটিন ডাকচে। য্যাখন যে ডাকে চলে আসি।'

লখিন্দর বুঝতে পারে মাঝবয়সী এই লোকটা কলকাতার জনসভায় গিয়ে গিয়ে একেবারে ঘাঘু হয়ে উঠেছে। সে গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'কী খাওয়ায় মীটিনে গেলে?'

লোকটা বলে, 'হাতরুটি, আলুর দম, বোঁদে। এই সব।'

'যা দ্যায় তাতে পেট ভরে?'

'না ভরলে অ্যাত বার করে আসচি কেন?' একটু চুপচাপ। তারপর লোকটা সারীকে দেখিয়ে শুধোয়, 'তুমার পরিবার নাকিন?'

'হ্যাঁ—'লখিন্দর মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয়।

'কুথায় চললে?'

'কলকাতায়।'

'কাজে, না বেড়াতে?'

'দুটোই।'

কথার উত্তর দিচ্ছিল ঠিকই। কিন্তু মীটিং-এ খাওয়ার ব্যাপারটা ভেতরে ভেতরে লখিন্দরকে বেশ চঞ্চল করে তুলেছে। নানা গল্পসল্পর ফাঁকে সুযোগ করে নিয়ে সে বলে, 'মীটিনে যে যায় তারেই খেতে দেয় নাকিন?'

লোকটা বলে, 'লিচ্চয়।'

'ধর আমরা যদিন মীটিনে যাই, খেতে পাব?'

'পাবে। সত্যি যাবে নাকিন?'

সারী সবার চোখ বাঁচিয়ে গোপনে লখিন্দরকে উরুতে কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে খোঁচা মারে। লখিন্দর ঘুরে তাকাতেই ভুরু কুঁচকে চোখের ইশারা করে। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। ভিখিরির মতো মীটিং-এ গিয়ে মাগনায় খেতে তার ঘোর আপত্তি। সেটাই সে বুঝিয়ে দেয়।

লখিন্দর স্ত্রীর আপত্তি গ্রাহ্য করে না। দুটো লোকের এক বেলার খাই খরচ যদি বেঁচে যায় সেটা কি কম ব্যাপার! এমন একটা সুযোগ নষ্ট করার মতো শৌখিনতা তার নেই। তা ছাড়া কলকাতায় সে খুব বেশি আসে নি। বড় জোর তিন চার বার। এতগুলো লোকের সঙ্গ থাকলে খানিকটা বল ভরসাও পাওয়া যায়। সে মনে মনে ঠিকই করে ফেলেচে হাওড়ায় নামার পর সে এদের সঙ্গ ছাড়বে না। মুখ ফিরিয়ে লখিন্দর লোকটার দিকে তাকায়। বলে, 'যাব গ, যাব—'

লোকটা এবার বলে, 'তা হলে কথাটা পাকা করে লেওয়া যাক' বলে কোণাকুণি একটা বেঞ্চে যে শহুরে বসে ছিল তাকে ডাকে, 'অ মাধববাবু, মাধববাবু গ—'

যারা গাঁ-গঞ্জ থেকে গাদা গাদা মানুষ জোগাড় করে কলকাতার বিপুল জনসভায় নিয়ে চলেছে, মাধববাবু তাদেরই একজন।

মাধব বলে, 'কী বলছ?'

লখিন্দর আর সারীকে দেখিয়ে লোকটা বলে, 'এই দু'জনা আপনাদের মীটিনে যেতি চাইচে।'

মাধব উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'খুব ভাল কথা। যাবে, নিশ্চয়ই যাবে।'

লোকটা ডান হাতের আঙুলে ভাতের গ্রাসের মুদ্রা ফুটিয়ে মুখে কাছে বার তিনেক নাচিয়ে বলে, 'এটি পাবে তো বাবু ?'

মাধব বলে, 'পাবে পাবে। সবাই যখন পাবে তখন ওরাই বা পাবে না কেন ?'

মাধবকে বেশ খুশিই দেখায়। কলকাতার মীটিং-এর জন্য মানুষ জড়ো করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। লোকের ঘর সংসার আছে, কাজকর্ম আছে। সে সব ফেলে হুট করে বেরিয়ে পড়া অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আগে তবু ন'মাসে ছ'মাসে এক আধটা মীটিং হত। এক বেলা ভরপেট খাওয়া আর কলকাতা দেখানোর নাম করে লোক জোগাড় করতে অসুবিধা হত না, কিন্তু এখন তো ফি মাসেই কোনও না কোনও কারণে কলকাতায় মীটিং হয়। যদিও রেলের টিকিট কাটতে হয় না তবু ঘন ঘন কলকাতায় যেতে অনেকেই গাঁইগুঁই করে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা ধমক ধামক দিয়ে তাদের কলকাতায় আনতে হয়। সেখানে অযাচিতভাবে লখিন্দররা যে তাদের সঙ্গে মীটিং-এ যেতে চেয়েছে, এটা মাধবের পক্ষে আনন্দের কারণ বৈকি।

মাধব কিছুক্ষণ লখিন্দরের সঙ্গে কথা বলে। তারা কোত্থেকে আসছে, কাজকর্ম কী করে, কলকাতায় কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে জেনে নেয়। তারপর সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে, মুখ ফিরিয়ে আরেকজনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়।

সারী এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার চাপা গলায় লখিন্দরকে বলে, 'তুমি কী গ!'

. লখিন্দর বলে, 'কী হল ?'

'তুমায় এত করে চোখ টিপলুম, কিন্তুন গেরাহ্যিই করলে না ? ওরা আমাদেরকে কী ভাবলে বল দিকিনি—বাপের জন্মে খেতে পাই না।'

'আরে বাপু, মাগনায় খাওয়ার ব্যবস্থা যে করলাম তার পেচনে মতলব আছে'।

'কিসির মতলব ?'

লখিন্দর স্ত্রীর দিকে ফিরে শুধোয়, 'দু'জনার এক বেলার খোরাকির খরচাটা যে বাঁচল তাতে কলকাতায় আরো এক বেলা বেশি থাকতে পারব—না কী ?'

এটা আগে ভাবে নি সারী। দু চোখে খুশি আর বিস্ময় ফুটিয়ে লখিন্দরকে লক্ষ্য করতে করতে বলে, 'সত্যি তো! তুমার কি বুদ্ধি গ।' বলে স্বামীর হাতে আলতো করে চিমটি কাটে।

## চোদ্দ

ভর দুপুরে ট্রেনটা হাওড়ায় এসে থামে। সঙ্গে সঙ্গে কামরায় কামরায় হুলুস্থুল শুরু হয়ে যায়। যে বাবুরা গাঁয়ে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে লোক জোগাড় করেছিল তারাই তাড়া দিয়ে সবাইকে ট্রেন থেকে নামায়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'এই, কেউ অন্য দিকে ছিট্‌কে যেও না, সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়।'

এই বাবুরা বছরে পঞ্চাশ বার করে গাঁ থেকে লোক এনে কলকাতায় ঢেলে দিচ্ছে। হাওড়া বা শিয়ালদা স্টেশন থেকে কিভাবে ব্রিগেডে বা সিধো-কানো ডহরে নিয়ে যেতে হবে সে সম্বন্ধে তাদের দক্ষতা প্রায় কমপিউটারের মতো।

ট্রেন থেকে যারা নেমেছিল সেই বিপুল জনতাকে কয়েক মিনিটের ভেতর একটা সুশৃঙ্খল মিছিলে পরিণত করে ফেলে বাবুরা। তাদের অনেকেরই হাতে প্ল্যাকার্ড আর ছোট ছোট ফ্ল্যাগও ধরিয়ে দেয়। তারপর মিছিলটা নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে চলে। ট্রেনের সেই মাঝবয়সী স্কয়াটে চেহারার লোকটার গায়ে প্রায় গা ঠেকিয়ে লখিন্দর আর সারীও সবার সঙ্গে পা ফেলছিল।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুবার মুখে লখিন্দরদের চোখে পড়ে, অন্য তিন প্ল্যাটফর্মে আরো তিনটে ট্রেন এসে থেমেছে। সেগুলো থেকেও ফ্ল্যাগ, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রামের মানুষ নামছে। অর্থাৎ তাদের মতো ওরাও নিশ্চয়ই মিছিল করে মীটিংয়ে যাবে।

লখিন্দরের মতো মিছিলের লোক ছাড়াও চারপাশে শুধু মানুষ আর মানুষ। প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে থিকথিকে ভিড়ের ভেতর দিয়ে সাব-ওয়ে পেরিয়ে লখিন্দরের মিছিল হাওড়া পুলের ওপর চলে আসে। দেখা যায় সামনের দিকে আরও দু-তিনটে মিছিল চলেছে। ওরা নিশ্চয়ই অন্য কোনও ট্রেনে তাদের আগে আগে হাওড়ায় পৌছে গিয়েছিল।

মিছিলের কারণে ব্রিজের ওপর শ'য়ে শ'য়ে বাস ট্রাম রিক্‌শা ঠেলা মিনিবাস দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিচে শীতের গঙ্গায় শান্ত নির্জীব স্রোত। দূরে

কয়েকটা জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা লঞ্চ জল কেটে কেটে নদী পারাপার করছে। নানা রঙের পাল তুলে অলস ভঙ্গিতে ক'টা নৌকো বাতাসের টানে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

নদীর ওপারে কলকাতার উঁচু উঁচু বিশাল সব বাড়ি। মাথার ওপর পরিস্কার নীলাকাশ।

খুব কম বয়সে দু-একবার কলকাতায় এসেছিল সারী। এই বিশাল শহর সম্বন্ধে তার আবছা একটা ধারণা ছিল। ব্রিজে ওঠার মুখে নিচের নদীটাকে দেখিয়ে লখিন্দরকে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কী নদী গ?'

লখিন্দর জানত। সে বলে, 'মা গঙ্গা—'বলে হাতজোড় করে চোখ বুজে ভক্তিভরে মাথায় ঠেকায়।

দেখাদেখি সারীও তাই করে। তারপর অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে তাকাতে থাকে। একসময় বলে, 'কত মানুষ গ!'

লখিন্দর বলে, 'হুঁ।'

'কত গাড়ি:'

'হুঁ। ইরির (এর) নাম কলকাতা শহর।'

স্লোগানের দিকে লক্ষ্য নেই লখিন্দরদের, বিশেষ করে সারীর। সে মুগ্ধ হয়ে দু' পাশের উঁচু উঁচু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, ঝকঝকে দোকানপাট দেখছিল। আর লখিন্দর এসব তো দেখছিলই, তবে নিজের অজান্তে তার চোখ বার বার চলে যাচ্ছিল আকাশের বা রাস্তার ধারের গাছগুলোর দিকে। কিন্তু না, দু-চারটে কাক এবং চড়ুই ছাড়া অন্য কোনও পাখি নজরে পড়ছে না।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর তারা চৌরঙ্গীতে পৌঁছে যায়। এখানে আসতেই চোখে পড়ে আরও অনেক মিছিল তাদের আগে আগে চলেছে। হাওড়া পুলের মতো এখানেও অগুণতি গাড়ি মিছিলগুলোকে নির্বিঘ্নে চলে যাবার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

চৌরঙ্গী পেরুতে বেশি সময় লাগে না, আর কিছুক্ষণের মধ্যে লখিন্দররা বিশাল ময়দানে পৌঁছে যায়।

একধারে উঁচু মস্তবড় একটা মঞ্চ অনেক পতাকা আর চেয়ার টেবল দিয়ে সাজানো রয়েছে। তিন চারটে মাইকও দেখা যাচ্ছে সেখানে।

মঞ্চের সামনে খানিকটা জায়গা ছেড়ে বাঁশের ঘেরের এধারে শ্রোতাদের বসার ব্যবস্থা। আর যত দূর চোখ যায়, লম্বা লম্বা খুঁটি পুঁতে সেগুলোর

গায়ে লাউডস্পীকার বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মঞ্চের কাছাকাছি যারা বসার জায়গা পাবে না তারা যাতে নেতাদের ভাষণ শুনতে পায় তার সুনিপুণ ব্যবস্থা।

লখিন্দররা পৌঁছুবার আগেই কয়েক হাজার মানুষ ময়দানে চলে এসেছিল। তারা মঞ্চের কাছাকাছি অনেকটা অংশ দখল করে বসে আছে। তাই বেশ খানিকটা দূরে জায়গা পাওয়া গেল। ট্রেন থেকে নেমে যে দলটার সঙ্গে লখিন্দররা ময়দানে এসেছে তারাও আশেপাশে বসে পড়েছে।

সেই সকালে কুলতলিতে ট্রেনে চড়েছিল। তারপর হাওড়ায় নেমে এতটা রাস্তা মিছিল করে এসেছে। শরীর ক্লান্তিতে একেবারে এলিয়ে আসছে লখিন্দরদের। সারী আর সে ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দেয়। এটুকুই বাঁচোয়া, এটা শীতকাল। গরমের সময় হলে রোদের তেজে গা এতক্ষণে পুড়ে যেত।

অল্প অল্প উত্তুরে হাওয়া ময়দানের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে চোরা স্রোতের মতো। খোলা আকাশের নিচে শীতের নরম উষ্ণ রোদটা বেশ আরামদায়ক। কুলতলি থেকে এতটা ছোটাছুটির পর এখন চোখ যেন জুড়ে আসতে চাইছে লখিন্দরের।

চারপাশে যে সব লোকজন বসে বা আধশোয়া মতো করে পড়ে আছে তারা সকলেই নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ফলে গোটা ময়দান জুড়ে একটা হৈ চৈ চলছে।

পাশ থেকে সারী ফিস ফিস করে, 'হেই গ—'

চোখ বুজে গিয়েছিল লখিন্দরের, আস্তে আস্তে তাকিয়ে শুধোয়, 'কী বুলচিস?'

'বড্ড খিদে নেগেচে। কখুন এরা খেতে দেবে গ?'

হঠাৎ লখিন্দরেরও যেন মনে পড়ে যায়, খিদেটা তারও যথেষ্টই পেয়েছে। সেই সাতসকালে চাট্টি বাসি ঠাণ্ডা ভাত আর ডাল খেয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। এতক্ষণ খিদের কথাটা কেন যে তার খেয়াল হয় নি সেটাই আশ্চর্য। ব্যস্তভাবে সে বলে, 'দাঁড়া, খপর লিচ্চি।'

ট্রেনের সেই আধবুড়ো ক্ষয়াটে লোকটা খানিক দূরে বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। নামটাও তার মিছিলে আসতে আসতে জানা হয়ে

গেছে—অধর। লখিন্দর হাতের ভর দিয়ে উঠে অধরের কাছে চলে আসে। বলে, 'হ্যাঁ গ অধরদাদা, প্যাটে আগুন জ্বলতেচে। খেতি কখুন দেবে?'

অধরেরও খিদে পেয়েছিল নিশ্চয়ই। সে বললে, 'দেখি, মাধববাবুদের শুদিয়ে আসি।' বলে উঠে পড়ে, তারপর সোজা মঞ্চের দিকে চলে যায়। খুব সম্ভব মাধবরা ওখানেই কোথাও আছে।

লখিন্দর আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে।

সারী জিজ্ঞেস করে 'কিছু ব্যবস্থা হল?'

অধরের সঙ্গে যা কথা হয়েছে, সারীকে সব জানায় লখিন্দর।

সারী বলে, 'দেকো (দেখ), শ্যায ম্যাশ আবার আমাদেরকে নবডঙ্কা চুষিয়ে না দ্যায়।'

'আরে না না, এত লোকজনকে খাওয়াবে বলেচে। না খেতে দিলি সব্বাই মিলে ওদের ছিঁড়ে খাবে। এট্টু সবুর কর।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, বড় বড় ঝোড়া বোঝাই করে রুটি, শুকনো আলুর দম আর শালপাতার থালা এনে মাধববাবুরা লখিন্দরদের দিতে থাকে। শুধু মাধববাবুরাই না, ময়দানের নানা দিকে আরো অনেক ভলিণ্টিয়ার জনতাকে রুটি-তরকারি দিচ্ছে।

মাথাপিছু চারখানা মোটা মোটা আটার রুটি আর চার টুকরো আলু। দিতে দিতে মাধবাবুরা দেখিয়ে দেয় মঞ্চের ডান দিকে খানিক দূরে বড় বড় ড্রামে জল রাখা আছে। দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে ওখান থেকে সবাই জল খেয়ে আসতে পারে। তবে খাওয়া দাওয়া ঘণ্টাখানেকের ভেতর চুকিয়ে ফেলতে হবে। সাড়ে তিনটেয় মীটিং শুরু হবে, তখন ওঠাউঠি, এধারে ওধারে, যাওয়া চলবে না।

খাওয়ার পর লখিন্দররা এখন যে যার জায়গায় বসে আছে। রুটিগুলো বেশ পুরুই ছিল। পেট মোটামুটি ভরে গেছে। আর এক-আধখানা পেলে ভাল হত, কিন্তু তারা লক্ষ্য করেছে চারখানার বেশি কাউকেই দেওয়া হয় নি, তাই সে আর চায় নি। যাই হোক, পেট যা ভার আছে তাতে রাত পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। সে একটি বিড়ি ধরিয়ে ফুক ফুক করে টানতে থাকে। পাশ থেকে কে যেন ডেকে ওঠে, 'হেই গ দাদা—'

লখিন্দর ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। যে ডেকেছে তার বয়স ত্রিশ বত্রিশ। যুবকই তাকে বলা যায়। কালো রোগা লম্বাটে চেহারা। তার পাশে গোলগাল শ্যামলা একটি বউ। বড় বড় সরল চোখ বউটির, মাথায় জবজবে করে তেল মাখা। কপালে মেটে সিঁদুরের মস্ত টিপ। সিঁথিতেও মেটে সিঁদুরের ধ্যাবড়া টান। পরনে ডুরে শাড়ি, কপালের আধাআধি পর্যন্ত ঘোমটা টানা। নাকে ঝুটো লাল পাথর বসানো রুপোর নথ।

বোঝাই যায়, যুবকটি বউটির স্বামী। সস্ত্রীক কোনও এক দূরের গাঁ থেকে তারা কলকাতার এই জনসভায় এসেছে। লখিন্দরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে এক মুখ হেসে বলে, 'আমার নাম কাত্তিক। আলমপুর আমাদের ঘর। তুমাদের ?'

লখিন্দর তার গাঁয়ের নাম বলে। কাত্তিক অর্থাৎ কার্তিক লখিন্দরদের অঞ্চলটা ভাল করেই চেনে। বলে, 'কুলতলি ইস্টিশানে নেইমে যেতি হয় তো ?'

'হ্যাঁ।'

'তা দাদার নামটি কী গ ?'

লখিন্দর নাম বলে।

কার্তিক ছোকরাটি কথা বলতে ভালবাসে। চোখের ইশারায় সারীকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের বউদি নাকিন ?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় সামান্য কাত করে লখিন্দর।

'তা দাদা, মিটিনে কি এই পেথম এলে— না আগে আরও এসেচ ?'

'এই পেথম।' তুমরা ?'

'আমরাও পেথম।' বলে, পার্শ্ববর্তিনী বউটিকে দেখিয়ে গলা নামিয়ে দেয়, 'আমার বউ ময়না। মিটিনের বাবুরা য্যাখন কলকাতায় আসার কথা বুললে, ভাবলুম বউটারেও লিয়ে আসি। বউ তো আগে কখুনও কলকাতায় আসে নি। দুটো কাজ এখেন থিকে সেরে যাব। মিটিনও শুনব আর বউটারে কলকাতা দেকিয়ে দেবো।'

লখিন্দর নাকের বড় বড় দুই ছ্যাঁদা দিয়ে বিড়ির নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রগড়ের গলায় বলে, 'রথ দ্যাকা, কলা বেচা— দুটোই সারতে চাও।'

'হ্যাঁ গ দাদা। আমরা যেখেনে থাকি তার চারধারে আজ এখেনে কাল ওখেনে রোজই একটা না একটা হাট বসে। ঝিঙে কাঁকুড় পটল কপি—

যখনকার যা আনাজ পাই পাইকিরি কিনে নে হাটে ঘুরে ঘুরে বেচে আসি। মুখির কথা খসালেই তো আর আমাদের মতো মানষেরা কলকাতায় আসতে পারে না। একটা ফিকিরে য্যাখন এসেই পড়িচি বউটার সাধ মিটিয়ে যাব।'

লখিন্দর ভাবে কার্তিকের ব্যাপারটা তারই মতো। তাদের দু'জনেরই কলকাতায় আসার বড় একটা কারণ এই বিপুল শহরে ঘুরে ঘুরে স্ত্রীদের মনোরঞ্জন করা। লখিন্দর জানিয়ে দেয় সে-ও স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতার দেখবার জায়গাগুলোতে ঘুরবে। তবে পাখির জন্য সরাসরি খদ্দের জোগাড় করা যে এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য সেটা আর জানায় না।

লখিন্দর গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'এখেনে কুথায় কুথায় ঘুরবে কিছু ঠিক করেচ ?'

কার্তিক বলে, 'চিড়িয়াখেনা আর মরা জন্তু যেখেনে রাখে—এই দু'জায়গায় তো যাবই। তা ছাড়া একটা সিনিমা দেকব (দেখব), রানীর বাড়ি (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল) দেকব। কালিঘাটে মা কালীর থানে পুজো দেবো। আর শুনিচি মাটির তলা দে রেলগাড়ি যায়। তাতে চড়তে না পারলি মনিষ্যি জেবন ব্রেথা (বৃথা)। ওটি চড়তেই হবে গ দাদা। তা তুমরা কুথায় কুথায় ঘুরবে ?'

লখিন্দর খানিক চিন্তা করে বলে, 'তুমি যে সব জায়গার কথা বললে আমরাও সেখেনে সেখেনে যাব। মাটির নিচেকার রেলগাড়ির কথা আমিও শুনিচি। ওটিতেও চড়ব। কিন্তুন—'

'কী ?'

'অ্যাত জায়গায় তো একদিনে ঘোরাঘুরি করা যাবে নি।'

'তা ঠিক।'

'তা হলি ?'

লখিন্দরের এই প্রশ্নটার উদ্দেশ্য হল, কলকাতার দর্শনীয় জায়গাগুলোতে ঘুরতে হলে দু-চারদিন থেকে যেতে হবে। সে জেনে নিতে চায় এখানে কার্তিকদের কোনও আস্তানা আছে কিনা। থাকলে লখিন্দর অনুরোধ করবে তাদেরও যেন সেখানে নিয়ে যায়। খেতে দিতে হবে না। সারা দিন তারা শহর চষে বেড়াবে। খাওয়া দাওয়া রাস্তার হোটেলে সেরে নেবে। শুধু রাত্তিরে শোবার জন্য একটু জায়গা দরকার।

কার্তিক প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে শুধোয়, 'তা হলি কী ?'

লখিন্দর বুঝিয়ে দেয়।

কার্তিক বলে, 'না গ দাদা, অ্যামন জায়গা আমাদের লেই। আজকের রাতটা থেকে কাল সারা দিনে যতটা পারি দেকে, সন্ধের টেরেন ধরে ঘরে ফিরে যাব।'

লখিন্দর একটু দমে যায়। তার ধারণা ছিল কার্তিকরা বেশ কয়েকটা দিন এ শহরে থেকে যাবে। সে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে থাকবে কুথায় ?'

'যেকেনে বসে আচি, সেখেনেই রাত্তির কাটিয়ে দেবো। একটা তো মোটে রাত।' বলে হাসে কার্তিক।

লখিন্দর অবাক। বলে, 'এই খোলা মাঠের মদ্যিখানে রাত্তির কাটাবে!'

'আমরা একলা নাকিন! খপর লিয়েচি, আমাদের মতো আরো অনেকে এখেনে থেকে যাবে। কাল কলকাতা দেকে যা যার ঘরে ফিরবে।'

'এখুন তো শীতকাল। রাত্তিরে বড্ড হিম পড়ে। তার মদ্যি থাকবে কী করে ?'

কার্তিক হাসে, 'ঐ চাদর-টাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকব।'

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে তিনটেয় মিটিং শুরু হয়ে ঠিক পাঁচটায় শেষ হয়ে যায়।।

সূর্য ততক্ষণে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ময়দানের চারিদিকে উঁচু উঁচু গাছগুলোর ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতো ম্যাড়মেড়ে। যে মলিন আলোটুকু এখনও গাছ বা দূরের বড় বড় বাড়িগুলোর মাথায় এবং আকাশে লেগে আছে, দ্রুত তা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই শীতের বেলা নিভে যাবে, ঝপ করে নেমে আসবে অন্ধকার।

মিটিং ভাঙার পর কাতারে কাতারে মানুষ ময়দান থেকে চৌরঙ্গির দিকে চলে যেতে শুরু করেছে। এদের বেশির ভাগই যাবে হাওড়া কি শিয়ালদা স্টেশনে, সেখান থেকে যে যার বাড়ি।

মাধববাবু এবং অন্য সব ভলান্টিয়াররা লখিন্দরদের কাছে এসে তাড়া লাগায়, 'এই তোমরা বসে আছ যে! ওঠ-ওঠ, সব উঠে পড়। ট্রেন ধরতে হবে।'

ধড়মড় করে অনেকেই উঠে দাঁড়াল। তবে কার্তিক আর লখিন্দরের মতো বেশ কিছু লোকজন জানায় তারা আজ বাড়ি ফিরবে না।

মাধববাবু বলে, 'কবে ফিরবে?'

কেউ বলে, 'কাল,' কেউ বলে, 'পরশু'। লখিন্দর অবশ্য কোন উত্তর দেয় না। কেননা সে জানে না, কলকাতা দেখার পর নিজের কাজ চুকিয়ে কুলতলি ফিরতে তার ক'দিন লাগবে, এই মুহূর্তে তার জানা নেই।

মাধববাবু শুধোয়, 'নিজেরা নিজেরা ফিরতে পারবে তো?'

সবাই জানায়, পারবে।

মাধববাবু বলে, 'পরে ফেরা নিয়ে ঝামেলায় পড়লে আমায় কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।'

দেখা গেল, লখিন্দর আর কার্তিকরা ছাড়া বাদবাকি সবার কাছেই কলকাতায় আসা যাওয়াটা একেবারে জলভাতের মতো ব্যাপার। এই ময়দানের মিটিং-এ তারা যে কত বার এসেছে এবং পরে মাধববাবুদের তদারকি ছাড়া নিজেরাই ফিরে গেছে তার হিসেব নেই। তারা বলে, 'ভয় লেই গ মাধববাবু, আপনারে দুষব না।'

মাধববাবু বলে, 'ঠিক আছে।' তারপর যারা ফিরে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল তাদের সঙ্গে নিয়ে চলে যায়।

মাঠ এখন প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে শ'খানেকের বেশি লোক নেই। সবাই এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এবার উঠে লখিন্দরদের কাছে ঘন হয়ে আসে এবং নিজেরাই যেচে আলাপ জমিয়ে ফেলে। এদের কেউ এসেছে হুগলি থেকে, কেউ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোন গাঁ থেকে। নদীয়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া—পশ্চিম বাংলার নানা এলাকা থেকেও এসেছে কেউ কেউ। লখিন্দরদের মতো এরাও কলকাতা দেখে কাল ফিরে যাবে।

কার্তিক ভরসা দিলেও এই ফাঁকা মাঠে রাত কাটানোর ব্যাপারে লখিন্দরের যে ভয় ছিল না তা নয়। তবে এতগুলো মানুষ যখন থাকছে তখন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে।

নতুন যে লোকগুলোর সঙ্গে আলাপ হল তাদের ভেতর সবচেয়ে করিৎকর্মা হরেন জানা। সে তার গোটা সংসার অর্থাৎ বউ এবং তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে মিটিং-এ এসেছে। এই প্রথম নয়, পনের বিশ বছর ধরে, তার বিয়ের অনেক আগে থেকেই কলকাতার জনসভায় তার নিয়মিত যাতায়াত। মিটিং-এ হাজিরা দিয়ে দিয়ে সে একেবারে ঘুণ হয়ে উঠেছে।

হরেন লোকটা অত্যন্ত তুখোড় এবং নিজের স্তরের মানুষদের নেতৃত্ব দেবার জন্মগত একটা ক্ষমতা তার রয়েছে। পলকে মাঠের একশ' লোকের ওপর তার আধিপত্য জারি করে ফেলে।

হরেন বলে, 'রাত্তিরে যাতে কষ্টটা বেশি না হয়, আগে তার ব্যবোস্থাটা করে ফেলা যাক। ক'জন গিয়ে ছেঁড়া কাগজ, কাঠ কুটরো, বাঁকারি—সব কুড়িয়ে এনে জড়ো করে রাখো।'

কে একজন জিজ্ঞেস করে, 'কাঠকুটরো দে কী হবে?'

'আরে বাপু, রাত্তিরে য্যাখন হিম পড়বে, এই মাঠের মদ্দি শীতে জমে যাবে যে গ। ওম চাই, বুইলে (বুঝলে) কিনা, ওম চাই। সারা রাত্তির আগুন জ্বেইলে রাখব। লইলে ঘুমুতে পারবে নি।'

ফাঁকা সভাস্থল জুড়ে প্রচুর ছেঁড়া কাগজ, কাঠ আর বাঁশের টুক্‌রো, প্ল্যাকার্ড, এঁটো শালপাতার থালা পড়ে ছিল। ক'জন গিয়ে সে সব কুড়িয়ে এনে হরেনের নির্দেশমতো সাত আট জায়গায় স্তূপাকার করে রাখে।

হরেন জানায় রাতে যখন জাঁকিয়ে শীত পড়বে, কাঠকুটোর স্তূপে আগুন ধরিয়ে সেগুলোর চারপাশে সবাই গোল হয়ে ঘুমোবে। এক জায়গায় আগুন জ্বাললে তার উত্তাপ এত লোকের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা একটা মাত্র অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে একশ মানুষের শোবার জায়গা হবে না। সাত আটটা হলে সবাই ভাগাভাগি করে আগুনের কাছাকাছি শুতে পারবে।

লখিন্দররা দুটো পুরনো তুষের চাদর আর অল্প ক'টা জামাকাপড় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। লখিন্দর ভাবে, চাদর মুড়ি দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে শুলে তেমন কষ্ট হবে না। এমন একটা ব্যবস্থার জন্য হরেনের প্রতি তার রীতিমত শ্রদ্ধাই হয়।

হরেন এবার শুধোয়, 'কারা কারা এই পেথম মাগ ছেলেপুলাকে কলকাতা দেকাতে এনেচ?'

ভিড়ের ভেতর থেকে বেশ ক'জন সাড়া দেয়, 'আমরা-আমরা—

দেখা গেল অনেকেই প্রথম এসেছে। হরেন বলে, 'এক কাজ কর। কাছাকাছি অনেক দেখার জিনিস আচে। বেশিদূর যেও নি। সব দেকে-টেকে ফিরে এস।'

সূর্য কখন ডুবে গেছে কারও খেয়াল ছিল না। যেদিকে যতদূর চোখ যায় অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। চৌরঙ্গির দিকের উঁচু উঁচু বাড়িগুলো কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে এখন স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে।

সবাই অবশ্য রাতের কলকাতা দেখতে পেল না। তারা পশ্চিম বাংলার দূর দূর অঞ্চল থেকে অনেকটা রাস্তা ট্রেনে, খানিকটা হেঁটে মিটিং-এ আসার পর এখন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকেই জানাল, কলকাতায় যা দেখার কাল দেখবে। আজকের রাতটা জিরিয়ে নেওয়া দরকার।

তবে পনের কুড়ি জনের অফুরন্ত উৎসাহ। বিশেষ করে সারীর। লখিন্দরের আজ আর হাঁটাহাঁটি করার ইচ্ছে ছিল না। ক'দিন আগে খুব জ্বর গেছে। ফলে শরীরটা বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সারী তাকে জিরোতে দিলে তো! তাড়া দিয়ে দিয়ে উঠিয়ে ছাড়ল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং চৌরঙ্গির ঝলমলে চোখ-ধাঁধানো আলোয় খানিকক্ষণ ঘুরে একটা ছোট দোকান থেকে রাতে খাবার জন্যে মুড়ি বাদাম আর বাতাসা কিনে এক সময় ময়দানে ফিরে আসে লখিন্দররা।

## পনেরো

সারারাত আগুনের পাশে আরামে ঘুমিয়ে পরদিন সকালে উঠে শ'খানেক লোক কলকাতার নানা দিকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার মানুষজনকে জিজ্ঞেস করে করে লখিন্দররা কার্তিক আর তার বৌয়ের সঙ্গে প্রথমে আসে গঙ্গায়। স্নানটা করে নেওয়া দরকার।

গঙ্গাস্নানের পর তারা প্রথমে যায় কালিঘাটে। সেখানে পুজো দিয়ে খাবারের দোকানে গিয়ে পেট পুরে সিঙাড়া কচুরি জিলিপি খায়। তারপর চিড়িয়াখানায় চলে আসে। ঘুরে ঘুরে জন্তু জানোয়ার দেখতে দেখতে দুপুর প্রায় পার হয়ে যায়।

চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে হঠাৎ লখিন্দরের হুঁশ হয়, এভাবে ঘোরাঘুরি করলে হাতের পয়সা খরচ তো হয়ে যাবেই, আসল যে কাজে আসা সেটা হবে না। সে কার্তিককে শুধোয়, 'জন্তুর বাগান থিকে বেইরে (বেরিয়ে) তুমরা কী করবে?'

কার্তিক বলে, 'ইধার উধার আর খানিকক্ষণ ঘুরে ঘুরে হাওড়ায় গে টেরেন ধরব।'

লখিন্দরের মনে পড়ে যায়, কালই কার্তিক বলেছিল, আজ তাদের ফিরে যেতে হবে। সে বলে, 'তা হলি তুমরা ঘুরে কলকাতা দ্যাকো, আমরা চলি—'

কার্তিকের ইচ্ছা ছিল, তাদের সঙ্গে লখিন্দররা শহর দেখে বেড়াক। একটু অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'কুথায় যাবে তুমরা?'

লখিন্দর বলে, 'আমাদের এট্টু কাজ আচে।'

কার্তিক বলে, 'তবে যে কাল বুললে কলকাতা দেকতে এয়েচ।'

'কলকাতা দেকতে এয়েচি, সেই সন্‌গে কাজটাও সেরে যাব।'

সারীও ভেবে রেখেছিল আজ সারা দিন কার্তিকের সঙ্গে শহর দেখে বেড়াবে। মূল যে উদ্দেশ্যে তাদের কলকাতায় আসা, সেটা তার খেয়াল ছিল না। লখিন্দরের কথায় তা মনে পড়ে যায়। কাল দুপুর থেকে আজ দুপুর, গোটা একটা দিন মোটামুটি অনেকটা বেড়ানো হল। সারাক্ষণ ফুরফুরে মেজাজে ভ্রমণ করলেই চলবে না। কাজ চুকিয়ে আবার না হয় ঘোরা যাবে। মুখে না বললেও মনে মনে লখিন্দরের কথায় সে সায় দেয়।

কার্তিক শুধোয়, 'কী কাজ গ দাদা?'

লখিন্দর বল, 'ক'জনার সন্‌গে এট্টুস দেকা করতে হবে।'

'তা হলি আর কী করা! কাজ ফেইলে বেড়ানোটা তো আর ঠিক লয়।'

লখিন্দর একটু হাসে।

কার্তিক ফের বলে, 'দুটো দিন তুমাদের সন্‌গে বড্ড আনন্দে কাটল গ দাদা। যদিন কখুনো আলমপুরের দিকি আসো, যাকে ইচ্ছে শুদিয়ো (শুধিও) কাত্তিক বেরার ঘর কুথায়, সে ঠিক দেকিয়ে দেবে।'

লখিন্দর বলে, 'আলমপুরে গেলি লিচ্চয় তুমাদের সন্‌গে দেকা করে আসব। তুমরাও কুলতলিতে এলি আমাদের ঘর এস।'

'আসব আসব'।

'আচ্ছা চলি।'

'তুমরা কুন দিকি যাবে?'

'কলকাতার রাস্তা তো ভাল চিনি না। সন্‌গে ঠিকানা রয়েচে, দেকি লোকজনকে শুদিয়ে।'

কার্তিকরা আর দাঁড়ায় না, ময়দানের দিকে চলে যায়।

রাস্তায় এখন প্রচুর লোকজন। লখিন্দর জামার পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে। গিরীন তাতে তিনজনের ঠিকানা লিখে দিয়েছিল। সাহস করে একটা স্যুট-পরা লোকের কাছে গিয়ে চিরকুটটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'বাবু, ঠিকানাটা যদি পড়ে দ্যান—'

বিরক্ত চোখে লখিন্দরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে রূঢ় স্বরে লোকটা বলে, 'হটো—' তারপর জুতোর আওয়াজ তুলে চলে যায়।

দু'পা পিছিয়ে লখিন্দর বলে, 'উরি ব্বাস রে, কী মেজাজ!'

সারী বলে, 'সায়েব কিনা।'

এরপর একটা মঙ্গোলিয়ান চেহারার লোককে — খুব সম্ভব নেপালি বা লেপচা —চিরকুটটা দেখাতে সে বলে, 'কৌন্ ল্যাংগুয়েজমে লিখা?'

তার কথা বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে লখিন্দর।

লোকটা এবার কী আন্দাজ করে নিয়ে বলে, 'বাংলা নেহী জানতা।' বলে চলে যায়।

শেষ পর্যন্ত একজনকে দিয়ে পড়িয়ে লখিন্দর জানতে পারে, চিরকুটে যে তিনটে ঠিকানা লেখা রয়েছে তার একটা টালিগঞ্জে, একটা টালা পার্কে, আরেকটা হাতিবাগানে। হাতিবাগানে পাখির বাজার বসে। সেখানে জনৈক গণেশ কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। টালিগঞ্জে একজন পক্ষিপ্রেমিক রাজারাম বসু আর কাঁকুড়গাছিতে গ্রেট ইণ্ডিয়া সার্কাসের মালিক পরমেশ্বর মেননের সঙ্গে দেখা করা দরকার। তবে টালিগঞ্জ, কাঁকুড়গাছি এবং হাতিবাগান এখান থেকে অনেক দূর। হেঁটে গেলে সন্ধে পেরিয়ে যাবে। তা ছাড়া জায়গা তিনটে একদিকে নয়, শহরের তিন প্রান্তে।

লোকটা আরও জানিয়ে দেয়, কিভাবে কোন কোন নম্বর বাসে ঐ সব জায়গায় যাওয়া যায়। লখিন্দর বেশ কয়েক বার জিজ্ঞেস করে করে নম্বরগুলো মনে করে রাখে।

লোকটা চলে যাবার পর বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর এক বিরাট বাস রাস্তায় এসে পড়ে লখিন্দরেরা। এখানে অজস্র গাড়ি স্রোতের মতো ছুটে চলেছে। আর রয়েছে অসংখ্য মানুষের থিকথিকে ভিড়। কেউ দাঁড়িয়ে নেই, গাড়িগুলোর মতো প্রতিটি মানুষ যেন ছুটছে। যেদিকেই তাকানো যাক শুধু দমবন্ধ-করা ব্যস্ততা।

রাস্তার দু'ধারে আকাশ-ছোঁয়া উঁচু উঁচু বাড়ি। সেগুলোর নিচতলায় কাচ দিয়ে ঘেরা সারি সারি সব দোকান। জুতো, জামাকাপড়, টিভি, ফ্রিজ থেকে শুরু করে কত রকমের দামি-দামি জিনিস যে সেখানে সাজানো রয়েছে তার হিসেব নেই। এই জিনিসগুলোর বেশির ভাগের নাম তো জানেই না লখিন্দরেরা, তাদের চোদ্দ পুরুষে কেউ কোনওদিন চোখেও দেখে নি।

দু'ধারে শুধু দোকানপাটই নেই, রয়েছে অগুনতি রেস্তোরাঁ, বার।

চলতে চলতে সারী বলে, 'আমি আর হাঁটতে পারচি না গ, পা ভেরে আসচে।'

তারা গাঁয়ের মানুষ। দু-দশ মাইল হাঁটা তাদের কাছেও কোনও কষ্টকর ব্যাপারই না। কিন্তু কাল সেই দুপুরে হাওড়া স্টেশনে নামার পর হেঁটে এসেছে ময়দানে। রাতটা অবশ্য ঘুমোতে পেরেছিল। কিন্তু সকাল থেকে আবার হাঁটা শুরু হয়েছে। ময়দান থেকে গঙ্গা, সেখান থেকে চিড়িয়াখানায় গিয়ে ঘোরাঘুরি, তারপর বেরিয়ে এসে একটানা হাঁটাই চলছে।

সারী আবার বলে, 'এট্টু বসে জিরিয়ে লিই।'

লখিন্দর বলে, 'টালিগঞ্জের কাজটা চুকিয়ে লিই, তারপর জিরোস।'

'পা তো চলচেই না। তার ওপর খিদেয় পেটের নাড়ি জ্বলে যাচ্চে। আগে দেখ কুথায় চাট্টি ভাত মেলে। ভাত খেয়ে জিরিয়ে তারপর টালিগঞ্জে যাব।'

সারীর কথায় লখিন্দরের হুঁশ হয়, খিদেটা তারও পেয়েছে। কাল সেই কোন সকালে চাট্টি বাসি কড়কড়ে ভাত খেয়ে বেরিয়েছিল, তারপর এই দুপুর পর্যন্ত ভাতের মুখ দেখে নি। রুটি মুড়ি কচুরি জিলিপি খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। অথচ তাদের হলে গিয়ে ভাতের নাড়ি। যতই এটা সেটা ছাতামাতা খাও, পেটে ভাত না পড়লে মনে হয় খাওয়াই হল না।

লখিন্দর বলে, 'ঠিক বুলেচিস। চ, একটা হোটেল খুঁজে বার করি। খেয়ে দেয়ে টালিগঞ্জে যাব।'

রাস্তার একটা লোককে হোটেলের কথা জিজ্ঞেস করতে সে একটা এয়ার-কণ্ডিশানড বার-কাম-রেস্তোরাঁ দেখিয়ে দেয়।

বিশাল দরজার সামনে যে ঝকঝকে উর্দিপরা দারোয়ান বসে ছিল, একটা দারুণ বিদেশি লিমুজিন সামনে এসে থামতেই সে দৌড়ে গিয়ে

গাড়ির দরজা খুলে দিতে যায়। যিনি এসেছেন তিনি এই রেস্তোরাঁর নিয়মিত খদ্দের এবং নিশ্চয়ই প্রচুর বখশিস দিয়ে থাকেন।

রেস্তোরাঁর দরজায় দারোয়ান নেই। এই ফাঁকে সারী এবং লখিন্দর ভেতরে ঢুকে পড়ে। চারিদিকে অগুনতি টেবিলে নারীপুরুষ বসে আছে। তাদের সামনে নানা আকারের প্লেটে প্রচুর সুখাদ্য, এ ছাড়া রয়েছে উত্তেজক রঙিন পানীয়। সামনের দিকে একটা উঁচু মঞ্চে অতি সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে, শরীরের প্রায় চোদ্দ আনা উন্মুক্ত রেখে কোমর এবং বুক দুলিয়ে দুলিয়ে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবতী হাতে মাইক নিয়ে গান গাইছে। মেয়েটার শরীর এবং গান থেকে সেক্সের ঝাঁঝ বেরিয়ে আসছে। গান শুনতে শুনতে কাস্টমাররা খাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ এই দুপুরবেলাতেই নেশায় বেশ চুর হয়ে আছে। জড়ানো স্বরে তারা তারিফের ভঙ্গিতে বলে, 'বহুত আচ্ছা ডার্লিং—'

চারিদিকে তাকিয়ে লখিন্দর আর সারী! একেবারে হকচকিয়ে যায়। এমন পরিবেশে আগে তারা কখনও আসে নি।

লখিন্দর চাপা গলায় বলে, 'এ কুথায় এলুম রে সারী স্বপ্নো দেকচি না তো।'

সারী [illegible] বলে, 'হুঁ।'

দু-একটা টেবিল এখনও ফাঁকা পড়ে আছে। লখিন্দর বলে, 'দেঁড়িয়ে থেকে কী হবে? চ বসি—' একটা ফাঁকা টেবিলের দিকে এগুতে গিয়ে কী ভেবে থমকে যায়।

সারী বলে, 'কী হল, থেইমে পড়লে কেন?'

লখিন্দর ফিস ফিস করে বলে, 'চ্যারে (চেয়ারে) বসে দরকার লেই। আমরা লিচেই বসি।'

টকটকে লাল, নরম কার্পেটের ওপর লখিন্দররা বসতে যাবে, একজন স্টুয়ার্ড দৌড়ে আসে, 'এই এই তোমরা কারা?'

লখিন্দর হাতজোড় করে বলে, 'আমাদের তো চিনতে পারবেন না বাবুমশাই। আমরা কুলতলির উদিকে রামনগর গাঁ—সিখেনে থাকি।'

রূঢ় গলায় স্টুয়ার্ড জিজ্ঞেস করে, 'এখানে কী চাই?'

লখিন্দর ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমরা খেতি এসিচি। ভাত, ডাল, তরকারি আর ধরেন গে মাছ। এমন জায়গায় তো এ জন্মে আর আসা

হবে নি। তা মাংসটাও খাব। দু'জনার খেতি কিরকম লাগবে বাবুমশাই?'

এবার চারপাশে যারা খাচ্ছিল কিংবা ড্রিংক করছিল, সবার চোখ এসে পড়ে লখিন্দরদের ওপর। এমন কি গাইয়ে মেয়েটাও গান থামিয়ে অসীম কৌতুকে তাদের দিকে তাকিয়েছে। এমন আজব কাস্টমার আগে আর কখনও এই রেস্তোরাঁয় আসে নি।

স্টুয়ার্ড বলে, 'আড়াই'শ টাকা।'

'আড়াই'শ! চোখের তারা প্রায় কপালে উঠে যায় লখিন্দরের।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আড়াই'শ দিতে পারবে?'

'বলেন কি বাবুমশাই, আমরা সোয়ামি-ইস্তিরিতে (স্বামী-স্ত্রীতে) সারা মাস একশ ট্যাকায় চালাই। আর আপনি একবেলার খোরাকির জন্যে বুলচেন আড়াই'শ! কদ্দিন গায়ে খাটলে আড়াই'শ রোজগার হয় আপনার হিসেব আচে?'

চারপাশের খদ্দেররা হো হো করে হেসে ওঠে। ক্রুনার, অর্থাৎ গাইয়ে যুবতীটি বাংলা বোঝে। সে-ও এমন মজার কথায় হেসে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে।

রেস্তোরাঁর ক্যাশ-কাউণ্টারে ম্যানেজার বসে ছিল। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'নিকাল দো ও দোনোকো—'

স্টুয়ার্ড লখিন্দরের একটা হাত ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে যায়। সারীও তাদের পেছন পেছন প্রায় ছুটতে থাকে।

একটানে দরজা খুলে লখিন্দরকে একরকম ধাক্কা মেরে বাইরের ফুটপাথে ছুঁড়ে ফেলে দেয় স্টুয়ার্ড। বলে, 'যাও ভাগো—'

সারী কাছে গিয়ে লখিন্দরকে টেনে তোলে। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কি গ, নেগেচে খুব?'

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ায় লখিন্দর। বলে, 'না।' তারপর রেস্তোরাঁটার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচে বলে, 'শালো ডাকাতের পো ডাকাত! দুটো মানুষের খাবার জন্য বলে কিনা আড়াশ'শ ট্যাকা নাগবে! ট্যাকা খোলাম কুচি! অমুন হোটেলের মুকে মুতে দিই।' গালাগাল দেবার পর সে খানিকটা শান্ত হয়।

সারী জিজ্ঞেস করে, 'অখুন কী করবে?'

'দেকি আর কুনো হোটেল পাওয়া যায় কিনা।'

ওরা দু'জনে হাঁটতে থাকে। কিন্তু লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে অন্য যে সব হোটেলের খোঁজ পায় সেগুলো আগেরটার মতোই। যে অভিজ্ঞতা খানিক আগে তাদের হয়েছে তাতে পরের রেস্তোরাঁগুলোতে ঢুকতে তাদের সাহস হয় না।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে দেখতে পায় তাদের সামনে সেই চেনা ময়দান। শহরের গোলকধাঁধার ভেতর ঘুরতে ঘুরতে তারা কিভাবে এখানে এসে পড়েছে নিজেরাই জানে না।

লখিন্দর বলে, 'আজ আর কপালে ভাত নেই রে সারী। চ, মাঠে বসে জিরিয়ে লিই।'

ময়দানে গিয়ে সবুজ ঘাসে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে দু'জনে। ক'টা ফেরিওলা আশেপাশে ঘুর ঘুর করছিল। তাদের একজনকে ডেকে মুড়ি-বাদাম কিনে চিবুতে থাকে।

লখিন্দর বলে, 'একটা কথা ভেবে দ্যাক সারী।'

সারী বলে, 'কী গ?'

'দু'জনার একবেলা একপেট করে খেতি আড়াই'শ! অ্যামন শহরে মানুষে থাকে!'

'তা ঠিক। কিন্তুন ঐ হোটেলের ভেতরটা কী সোন্দর! গান শুনতি শুনতি চেয়ারে বসে খাওয়া দাওয়া। কলকাতায় না এলি এমন একখানা জায়গা দেকা হত না। তা ছাড়া দোকানগুলোয় দেকেছিলে! কী সব জিনিস! এ জন্মে ঐ সব জিনিস তো আর পাব নি। চোকে দেকেই জেবন সাত্থক হল।'

আসলে কলকাতা সারীকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এত বড় বড় বাড়ি, রাস্তাঘাট, লোভনীয় জিনিসপত্রের দোকান, কত রকমের গাড়ি—সব তাকে যেন জাদু করেছে।

মুড়ি চিবুতে চিবুতে লখিন্দর গলার ভেতর অস্পষ্ট আওয়াজ করে, 'হুঁ—'

ওরা যেখানে বসে আছে তার দু'পাশে অনেক লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে উঠছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'সাবাস, সাবাস।' বা 'কামাল কর দিয়া!'

সারীর কৌতূহলী চোখে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে তাকায়। তারপর লখিন্দরকে জিজ্ঞেস করে, 'অ্যাত নোক কী দেকচে গ?'

লখিন্দর আড়চোখে একবার জমায়েত দুটোর দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ সুরে বলে, 'কে জানে!'

সারীর সব ব্যাপারেই অসীম আগ্রহ। সে বলে, 'চল না, দেকে আসি—'

'কী হবে দেকে?'

'চল না—'

একরকম তাড়া দিয়ে দিয়ে সারী লখিন্দরকে উঠিয়ে ছাড়ে।

বিরক্ত গলায় লখিন্দর বলে, 'তোরে লিয়ে আর পারি না—' বলতে বলতে সারীর সঙ্গে ডান পাশের জমায়েতটার কাছে চলে যায়। ভিড়ের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পায় নানা রঙের চাপা প্যাণ্ট আর জামা পরা একটা লোক তার কপাল আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল লাল ফিতে দিয়ে কষে বাঁধা- হাঁটু গেড়ে বসে পাঁচ পাঁচটি রঙিন বল নিয়ে লোফালুফি করছে কিন্তু একটা বলও মাটিতে পড়ছে না। বলগুলো শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া এবং লুফে নেবার গতি ক্রমশ এমন বেড়ে চলেছে যে তার হাত দেখা যাচ্ছে না।

দর্শকদের মধ্যে নতুন করে হাততালি শুরু হয়ে যায়। সেই সঙ্গে চারপাশ থেকে টপাটপ পয়সা পড়তে থাকে। কেউ কেউ এক টাকা দু টাকার নোটও ছুঁড়ে দেয়।

এমন খেলা জীবনে আগে কখনও দেখে নি লখিন্দররা। খেলোয়াড় লোকটাকে যে জাগলার বলে তাও তাদের অজানা। তার কেরামতি দেখে স্বামী স্ত্রী দুজনেই চমৎকৃত।

মুগ্ধ গলায় লখিন্দর বলে, 'শালো জব্বর ওস্তাদ রে সারী।'

'সব্বাই পয়সা দিচ্চে। দাও না ওরে একটা ট্যাকা।'

লখিন্দর মুহূর্তে সতর্ক হয়ে যায়। খেলা দেখে মুগ্ধ হওয়া এক জিনিস কিন্তু নগদ একটি ট্যাকা খরচ করে তারিফ জানানোর মতো শৌখিন মানুষ নয় লখিন্দর। সে বিরক্ত মুখে বলে, 'ট্যাকা কি সোজা জিনিস রে, বড্ড কষ্ট করে রোজগার করতে হয়। সেই ট্যাকা দান-খয়রাত করতে বুলচিস! আয়, আয়, উধারে গে দেকি কী খেলা হচ্চে। কিন্তুন খবরদার, ট্যাকা দেবার কথা মুখে আনবা না।'

দু'জনে এবার বাঁ পাশের ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এখানে যে খেলাটা চলছে তা দেখতে দেখতে ভয়ে লখিন্দরদের চোখের তারা স্থির হয়ে যায়।

একটা মাঝবয়সী চীনা, তার পরনে শুধুমাত্র একটা হাফ প্যান্ট, জামা টামা নেই—দুটো বড় বড় চকচকে ছোরা আকাশের দিকে ছুঁড়ে ছুড়ে পিঠ এবং পেটের পেশী কখনও শক্ত কখনও নমনীয় করে ধরছে কিন্তু রক্তপাত ঘটছে না।

দেখতে দেখতে দম বন্ধ হয়ে আসে লখিন্দরদের। ছোরার ফলা দুটো এতই ধারাল যে পেশীর সঙ্কোচন বা প্রসারণে এতটুকু গোলমাল হলে মাংস কেটে খসে যাবে।

প্রথমে চার পাঁচ ফুট ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে ছোরা দুটো শরীরে ধরে নিচ্ছিল চীনা খেলোয়াড়টা। ক্রমশ আরো অনেক উঁচুতে, প্রায় দশ পনেরো ফুট ওপরে ছুঁড়তে থাকে। আতঙ্কে মাঝে মাঝে চোখ বুজে ফেলছে লখিন্দর আর সারী। কিন্তু একবারও দুর্ঘটনা ঘটছে না।

এদিকে দর্শকরা চিৎকার করে হাততালি দিয়ে খেলোয়াড়টাকে তারিফ করছে আর পাগলের মতো চারপাশ থেকে রেজগি বা এক টাকা দু টাকা পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ছে।

একসময় খেলা শেষ হয়। মুগ্ধ জনতা ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে।

লখিন্দররা কিন্তু যায় নি। ভিড় পাতলা হয়ে গেলে তারা চীনা খেলোয়াড়টির কাছে এগিয়ে আসে। চীনাটি তখন দর্শকদের ছোঁড়া টাকা পয়সা কুড়িয়ে এক টুকরো লাল কাপড়ে গুছিয়ে রাখছে।

লখিন্দরদের দেখে লোকটা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, 'কিছু বলবে?' সে বাংলা জানে, তবে উচ্চারণটা বাচ্চাদের মতো আধো আধো।

লখিন্দর শুধোয়, 'অ্যামন খেলা কদ্দিন দেখাচ্চ?'

'সে কি আর মনে আছে! তবে পনের বিশ বছর তো হবেই।'

'তুমার ভয় করে না?'

'কিসের ভয়?'

'এই ধর যদিন গ্যায়ে ছোরা গেঁথ্যে যায়।'

'আগে আগে যেত। কত যে রক্ত পড়েছে তোমায় কী বলব! তবে অনেক প্রাকটিস করার পর এখন আর কেটে কুটে যায় না।'

'কিন্তুন—'

'কী?'

এই খেলার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা বা ভয় কোনওটাই কাটছে না লখিন্দরের। সে বলে, 'ধর এট্টু অসাবধান হয়ে পড়লে। ত্যাখন তো দুঘ্‌ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

চীনাটি বলে, 'তা তো হতেই পারে। তবে আমি খুব হুঁশিয়ার থাকি।'

'বড্ড সব্বনেশে খেলা গ তুমার!' মনেপ্রাণে এই ছোরা ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না লখিন্দর।

চীনাটি হাসে। বলে, 'কী করব বল। স্রেফ পেটের জন্যে এটা করতে হয় আমার। নইলে ভুখা মরে যাব।' পয়সাকড়ি একটা থলিতে ঢুকিয়ে, ছোরা দুটো খাপে পুরে সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চলি।'

চীনাটি আর দাঁড়ায় না, কোনাকুনি ময়দানের ওপর দিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে হাঁটিতে থাকে।

লখিন্দররা যায় উলটো দিকে। বড় রাস্তায় যেতে যেতে লখিন্দর বলে, 'মান্‌ষে পেটের জন্যি কত কী না করচে! কলকাতায় না এলে জানতেও পারতাম না রে সারী।' একটু থেমে বলে, 'এখেনেও সব্বাই সুখে লেই।'

সারী উত্তর দেয় না।

## ষোলো

একসময় লখিন্দররা বড় রাস্তা পেরিয়ে ওধারের বাস স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে চাপ-বাঁধা থিকথিকে ভিড়। সবাই বাসের জন্য অপেক্ষা করছে।

লখিন্দর হাত জোড় করে একটা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভালমানুষ গোছের লোককে বলে, 'বাবুমশাই, ছ লম্বর কি চার লম্বর বাস এলে আমাদের বুলে দেবেন। টালিগঞ্জ যাব।'

লোকটি সত্যিই ভাল। বলে, 'ঠিক আছে।'

পর পর পাঁচ ছ'টা চার এবং ছ নম্বর বাস আসে কিন্তু সেগুলোর ভেতর একটা ছুঁচ গলাবার জায়গা নেই। ভেতরে মানুষ তো ঠেসেই আছে, এমনি কি পা-দানিতে অনেকে ঝুলছে।

গাঁয়ে অঢেল ফাঁকা জায়গায় থাকার অভ্যাস লখিন্দরদের। এমন ভিড়ের বাস দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়, সারীকে নিয়ে দু'পা এগিয়ে দশ পা পিছিয়ে আসে। একের পর এক বাস এভাবে যদি বোঝাই হয়ে আসতে থাকে তারা উঠবে কী করে?

এদিকে অনেকক্ষণ আগেই শীতের বেলা হেলতে শুরু করেছে। দিনের আয়ু আর কতক্ষণ! খানিক পরেই সন্ধ্যা নেমে যাবে। দিনের আলো থাকতে থাকতে টালিগঞ্জে রাজারামবাবুর বাড়ি পৌঁছুনো দরকার। ওখানকার কাজ সারতে সারতে কতটা সময় লেগে যাবে কে জানে। রাত বেশি হলে আজ আর কাঁকুড়গাছি যাওয়া যাবে না। আর হাতিবাগানে যাবার তো প্রশ্নই নেই। গিরীন বলে দিয়েছে ফি রবিবার সকালে সেখানে পাখির বাজার বসে। কাল রবিবার, কাল সেখানে যাবে তারা, আজ গিয়ে লাভ নেই।

সেই লোকটি ওদের লক্ষ করছিল। সে বুঝতে পেরেছে, এভাবে গাদাগাদি-করা বাসে লখিন্দররা উঠতে পারবে না। কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'এক কাজ কর, তোমরা বাসে না গিয়ে পাতাল রেলে করে যাও। এই সময়টা ট্রেনে খুব ভিড় থাকে। তবু দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। টালিগঞ্জে পনের মিনিটে পৌঁছে যাবে।'

লখিন্দর বলে, পাতাল রেলের কতা ঢের শুনিচি। চড়বারও সাধ আচে। তা কুথায় ঐ টিরেন (ট্রেন) পাব বাবুমশাই?'

রাস্তায় কোনাকুনি, বেশ খানিকটা দূরে একটা লম্বাটে বাড়ি দেখিয়ে লোকটি বলে, 'ওটা পাতাল রেলের একটা স্টেশন। ওখানে যাও। দশ মিনিট পর পর ট্রেন পেয়ে যাবে।'

লখিন্দররা স্টেশনে চলে আসে। এখানেও প্রচুর মানুষ। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটে লখিন্দর। টিকিট কাউন্টার থেকে একটু এগুলে চলমান সিঁড়ি। সেটা দিয়ে আরও তিরিশ চল্লিশ ফিট নামলে প্ল্যাটফর্ম।

চারিদিক ঝকঝকে পরিষ্কার। কোথাও এতটুকু ধুলো বা কাগজের কুচি পড়ে নেই। মেঝেগুলো আয়নার মতো মসৃণ। যেদিকে তাকানো যাক, শুধু আলো আর আলো।

সারী বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। সব কিছু দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ পর বলে, 'কী বানিয়েচে গ! এ য্যানো ইন্দ্রপুরী।'

লখিন্দর ঘাড় কাত করে বলে, 'হ্যাঁ।'

কথা বলতে বলতে চলমান সিঁড়ির দিকে দু'জনে এগিয়ে যায়। তার পাশ দিয়ে মোজেক-করা অন্য সিঁড়িও রয়েছে।

অগুনতি মানুষ চলমান সিঁড়িতে করে নিচে নেমে যাচ্ছে। এতে কষ্ট করে পা ফেলতে হয় না। শুধু দাঁড়িয়ে থাকলেই হল, সিঁড়ি আপনা থেকেই নিচে নামিয়ে দেবে কি ওপরে তুলে আনবে। তবে এই সিঁড়িতে চড়ার কৌশলটা জানা দরকার।

সারীর খুব ইচ্ছা, চলন্ত সিঁড়িতে চেপে প্ল্যাটফর্মে যায়। কিন্তু সেটায় পা রাখতে সাহস হচ্ছে না। একবার সে পা বাড়ায়, পরক্ষণে টেনে নেয়। বলে, 'থাক গে, চল পাশের সিঁড়ি দে লেবে (নেমে) যাই।'

লখিন্দর বলে, 'অ্যামন সুযুগ জেবনে ফের কবে পাবি, ঠিক লেই। ঘুরন্ত সিঁড়িতেই ওঠ—'

শেষ পর্যন্ত প্রচুর সাহস সঞ্চয় করে দু'জনে চলমান সিঁড়িতে উঠে পড়ে এবং নামার সময় টাল সামলাতে না পেরে এমন আছাড় খায় যে চারপাশের লোকজন ওদের আনাড়িপনায় হৈ হৈ করে হেসে ওঠে।

লখিন্দর বোকাটে হাসে আর সারী লজ্জায় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের এক ধারে গিয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু পরেই ট্রেন এসে যায়। বিপুল জনস্রোতে ধাক্কা খেতে খেতে একটা কামরায় উঠে পড়ে লখিন্দররা। কোথাও বসার জায়গা নেই। সিটগুলো আগে থেকে বোঝাই হয়ে আছে। তবে দু'জনে মোটামুটি ভালভাবেই দাঁড়াতে পেরেছে।

ট্রেনটা পনের সেকেণ্ডও দাঁড়ায় না। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে পলকে স্পিড তুলে ছুটতে শুরু করে।

লখিন্দররা যেখানে দাঁড়িয়েছে, তার বাঁ পাশেই দুই চীনা একটানা কী যে বলে যাচ্ছে। বিমূঢ়ের মতো সারী তাদের লক্ষ করতে করতে লখিন্দরকে শুধোয়, 'কোন ভাষায় কতা কইচে গ?'

লখিন্দর বলে, 'কে জানে—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই ডান পাশ থেকে গাঁক গাঁক করে তিন বিরাট চেহারার কাবুলিওলা নিজের মধ্যে কী আলোচনা শুরু করে দিল।

চমকে ওদের দিকে তাকায় লখিন্দররা। সারী বলে, 'এরা কারা গ? ইদের ভাষা দেকচি আরেক রকম।'

লখিন্দর হাঁ করে কাবুলিদের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলে, 'কলকেতায় যে কত জেতের মানুষ থাকে ভগমান জানে! বড্ড গোলমালের শহর রে—'

বার চোদ্দ মিনিটের ভেতর লখিন্দররা টালিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে যায়। তারপর একে ওকে ঠিকানা লেখা কাগজখানা দেখিয়ে রাজারাম বসুর বাড়িটা খুঁজে বার করতে বেশি সময় লাগে না।

বাড়িটা মাঝারি মাপের দোতলা। একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত প্রায় সব জায়গাতেই অজস্র পাখি। কোন পাখি খাঁচায়, কোন পাখি দাঁড়ে, তারের বড় বড় ঘর বানিয়ে তার ভেতর কিছু পাখিও রাখা হয়েছে। এখানে পা দেওয়ামাত্র টের পাওয়া যায় বাড়ির মালিক একজন সত্যিকারের পক্ষিপ্রেমিক, পাখিই তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

রাজারাম বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর নাম শাসমলবাবু আর গিরীনের মুখে অনেকবার শুনেছে লখিন্দর।

বছর পঞ্চাশেক বয়স ভদ্রলোকের। মজবুত স্বাস্থ্য। গায়ের রং টকটকে, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। পরনে পা-জামা আর বুশ শার্টের ওপর দামি শাল।

রাজারামের ব্যবহারটি চমৎকার। নিজের হাতে দরজা খুলে দিয়ে লখিন্দররা কুলতলি থেকে আসছে জেনে বাইরের ঘরে নিয়ে বসিয়েছেন। অবশ্য বার বার বলা সত্ত্বেও ওরা সোফায় বসে নি, মেঝেতে বসেছে।

রাজারাম একটা মোড়া টেনে এনে ওদের কাছে বসে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না—'

নিজেদের নাম জানিয়ে লখিন্দর বলে, 'বড় আশা লিয়ে আপনার কাচে এসিচি বাবুমশায়।'

'কিসের আশা?' একটু অবাকই হন রাজারাম।

লখিন্দর হাতজোড় করে বলে, 'কতাটা গোপন। অপরে কেউ জানলে আমার বিপদ হয়ে যাবে।' আসলে তার মাথায় নিশিকান্ত শাসমল চেপে বসে আছে। শাসমল জানলে তার কপালে দুঃখ আছে।

রাজারাম কৌতূহল বোধ করছিলেন। বলে, 'ঠিক আছে, কাউকে বলব না। নাও, শুরু কর—'

'বাবুমশায়, কুলতলির শাসমলবাবুর কাচ থিকে আপনি পাখপাখালি কেনেন তো?'

'হ্যাঁ, কিনি। তাতে কী হয়েছে?'

'সেই সব পাখি আমি ধরে দিই।'

এবার রীতিমত আগ্রহ বোধ করেন রাজারাম। বলেন, 'ও, তুমি তা হলে সেই লখিন্দর!'

লখিন্দর আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়, 'আজ্ঞে।'

'তোমার কথা শাসমলবাবুর মুখে শুনেছি। তোমার মতো পাখি-ধরিয়ে নাকি ওদিকে আর কেউ নেই।'

বিনয়ে মুখ নিচু করে লখিন্দর বলে, 'আপনাদের আশীব্বাদে দু-পাঁচটা ধরে ফেলি।'

'বেশ বেশ। তুমি আমার ঠিকানা পেলে কোথায়? শাসমলবাবুর কাছে?'

লখিন্দর গিরীনের নাম জানায় না। জানালে তার মুশকিল হতে পারে। সে বলে, 'পেলাম এক জায়গায়।'

রাজারাম মানুষটি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। একটু হেসে বলেন, 'যার কাছে পেয়েছ তার নাম বলবে না—এই তো? ঠিক আছে, বলব না। তোমরা যে আমার এখানে এসেছ, শাসমলবাবু জানে?'

'না।'

'আসল ব্যাপারটা হল, তোমাদের আসার খবরটা শাসমলবাবুর কাছে গোপন রাখতে হবে, তাই না?'

লখিন্দর হাতজোড় করেই ছিল। কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'আজ্ঞে বাবুমশায়। উনি জানতে পারলে খুব রাগ করবে। বলবে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়েচিলি শালা? তোর কাচ থিকে আর পাখি কিনব না। অ্যাখন না খেয়ে মরতি হবে আমাদের। ইদিকে—'

রাজারাম জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

লখিন্দর বলে, 'শাসমলবাবু পাখির যা দাম দ্যায় তাতে পেট চলে না বাবুমশায়।'

লখিন্দরদের কলকাতায় আসার উদ্দেশ্যটা এবার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায় রাজারামের কাছে। তবু তিনি বলেন, 'কিরকম পাও?'

'পাখি পিছু দু ট্যাকা। অনেক ধরা-করা করলেও তিন ট্যাকা চার ট্যাকা দ্যায় মাঝে মদ্যি।'

এত কম দাম পায় জেনে চমকে ওঠেন রাজারাম। তবে এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে বলেন, 'বুঝলাম। কিন্তু আমি কী করতে পারি

বল। শাসমলবাবুকে যে দাম বাড়িয়ে দিতে বলব তার উপায় নেই। কারণ তুমিই বলে দিয়েছ ওকে তোমার কথা জানানো চলবে না।'

'আপনি যদিন সিদে (সোজাসুজি) আমার কাচ থিকে পাখি ল্যান. এই গরিব বেঁচে যায়।'

খানিক চিন্তা করে রাজারাম বলে, 'কিন্তু একটু অসুবিধা আছে যে লখিন্দর।'

লাখিন্দর দমে যায়, 'কেন বাবুমশায় ?'

রাজারাম বলেন, 'শাসমলবাবু পাখি দেবে বলে আমার কাছ থেকে বহু টাকা আগাম নিয়েছে। তোমার কাছ থেকে পাখি নিলে তা উশুল হবে কী করে ?'

লখিন্দর কাকুতি মিনতি করতে থাকে, 'কত আসা নে এইচি আপনার কাচে। এট্টুস মুখ তুলে তাকান, লইলে মরে যাব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রাজারাম বলেন, 'ঠিক আছে, তোমার কাছ থেকে মাঝে মাঝে দু-চারটে পাখি আমি নেবো। তুমি কি নিজে এখানে পৌঁছে দেবে ?' বলেই কি ভেবে ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'তোমাকে আসতে হবে না। ক'টা টাকাই বা পাবে. কলকাতায় যাতায়াতের ভাড়া দিয়ে কিছুই থাকবে না। তুমি কোথায় থাক ?'

লখিন্দর তাদের গাঁয়ের নাম জানিয়ে ভীরু গলায় শুধোয়. 'আপনি কি আমাদের ওখেনে লোক পাটাবেন ?'

'হ্যাঁ। শাসমলবাবুদের লুকিয়ে আমার লোক তোমার কাছ থেকে পাখি নিয়ে আসবে।'

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় লখিন্দরের। বলে. 'আপনার দয়া বাবুমশায়।'

রাজারাম জিজ্ঞেস করেন, 'এবার শীতে তোমাদের ওদিকে কিরকম পাখি-টাখি আসছে ?'

'গোড়ায় গোড়ায় আসচিল না। ছুটকো ছাটকা দু-চারটে ইদিক সিদিক দেকা দিচ্চিল। কাল রেলগাড়িতে আসার সময় দেকলাম ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের উদিক পানে যাচ্চে।'

'খুব সুখবর। বুঝলে লখিন্দর, আমার এক ডজন মানে বারটা সেপাই বুলবুল দরকার।'

'সেপাই বুলবুল—ঐ যার চোখের তলায় লাল পট্টি, মাথায় খাড়া ঝুঁটি আর ন্যাজের তলাটাও লাল ?'

'হ্যাঁ।'

'পাবেন বাবুমশায়, তবে আমারে মাসখানেক সময় দিতি হবে। শীতের ঝোঁকটা এট্টু কাটুক—'

'ঠিক আছে। আর চাই গোটাচারেক শ্যামা—'

'পেয়ে যাবেন।'

'খুব ভাল। পাখি পিছু কিরকম নেবে ?'

চোখ নামিয়ে লখিন্দর বলে, 'আপনি বিবেচনা করে যা দ্যান।'

'একেক পাখির জন্যে পনের টাকা করে পাবে। রাজি ?'

লখিন্দরের কাছে এ একেবারে আশাতীত। অভিভূতের মতো সে বলে, 'আপনার দয়া বাবুমশায়—'

রাজারাম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'দয়া-টয়া কিছু নয়। তোমাকে যে কষ্ট করে পাখি ধরতে হয় তাতে ঐ টাকা কিছু না। তবে এর বেশি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। শোন, তোমাকে পঞ্চাশ টাকা আগাম দিচ্ছি। যখন পাখি দেবে, এই টাকাটা বাদ দিয়ে হিসেব করব।'

ফের লখিন্দর বলে, 'আপনার দয়া।'

রাজারাম একটা টেবিলের ড্রয়ার খুলে টাকা বের করে লখিন্দরকে দেন। টাকাটা মাথায় ঠেকিয়ে লখিন্দর বলে, 'এবেরে তা হলে আমরা যাই বাবুমশায়। ·য্যাত তাড়াতাড়ি পারি পাখির ব্যবস্থা করচি।'

'আসছে মাসে তোমার কাছে লোক পাঠাব।'

সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছিল। রাজারাম উঠে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে দেন। এদিকে লখিন্দররা উঠে পড়েছিল। হঠাৎ কিছু মনে পড়তে ব্যস্তভাবে রাজারাম জিজ্ঞেস করেন, 'আরে তোমরা এখন যাবে কোথায় ? কুলতলিতে ফিরবে ?'

লখিন্দর বলে, 'না আজ্ঞে—' তারা যে হাতিবাগানে পাখির বাজারে আর কাঁকুড়গাছিতে সার্কাসওলাদের কাছে যাবে সেটা আর বলে না।

'তা হলে রাত্তিরে থাকবে কোথায় ?'

'দেকি কুথায় থাকা যায়—'

এরপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে রাজারাম যখন জানতে পারেন, কলকাতায় ওদের থাকার জায়গা নেই, রাস্তাতেই রাত কাটাতে হবে তখন

খুব রেগে যান। বলে, 'আজ আর কোথাও যেতে হবে না। রাতটা আমার এখানে থেকে কাল সকালে চলে যেও।'

কৃতজ্ঞ লখিন্দর কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না। আবেগে তার গলা বুজে আসে।

বাড়ির একটা কাজের লোককে ডেকে রাজারাম বলেন, 'ভোলা, এদের মুখ হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা করে দে। তারপর চা-টা এনে দে। বৌদিকে বল, রাত্তিরে ওরা এখানে খাবে। থাকবেও।'

রাত দশটা নাগাদ রাজারাম এবং তাঁর স্ত্রী বাড়ির ভেতর রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে খুব যত্ন করে লখিন্দরদের খাইয়ে বাইরের ঘরে নিয়ে আসেন। এখানেই তাদের জন্য বিছানা পেতে দিয়েছে ভোলা।

রাজারাম বলে, 'এবার শুয়ে পড়। কাল সকালে দেখা হবে।' বলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান।

পাশাপাশি শুয়ে গম্ভীর গলায় লখিন্দর বলে, 'বুজলি সারী, মানুষ লয় এনারা—সাক্ষেৎ ভগমান। কলকেতায় না এলে বড্ড লোকসান হয়ে যেত রে—'

সারী লখিন্দরের মতো অত সোজা সরল নয়। বলে, 'অ্যাত খাতির করচে, নিচ্চয় কুনো স্বাত্থ আচে।'

'কিসির স্বাত্থ?'

'আমার মন বুলচে, শাসমলবাবুকে পাখির তরে রাজাবাবু যা দাম দ্যায় তার থিকে তুমারে কম দিতে চাইচে। সেই জন্যি অ্যাত তোয়াজ। খপর লিয়ে দেকো।'

'তা দিক। শাসমলবাবু পাখি পিছু দু-তিন ট্যাকা করে দিচ্চিল, সেই জায়গায় পনের করে দিচ্চে। কুনোদিন ভাবতে পেরিচি!'

সারী আর কিছু বলে না।

## সতেরো

পরদিন সকালে চা আর খাবার টাবার খাইয়ে তবে লখিন্দরদের ছাড়লেন রাজারাম।

আজ রবিবার। ছুটির দিন এবং সকালের দিক বলে বাস বা ট্রামে এখন ভিড় নেই। সারীর খুব ইচ্ছা ছিল আরেক বার পাতাল রেলে চড়ে। কিন্তু স্টেশনে এসে খবর পাওয়া গেল, রবিবার সকালের দিকে মাটির

তলার ট্রেন চলে না, চালু হবে সেই দুপুরের পর। অগত্যা রাস্তার লোকজনের কাছ থেকে হদিস জেনে বাসে করে হাতিবাগানে পৌঁছে যায় ওরা।

একটা বড় সিনেমা হল-এর উল্টোদিকে হাতিবাগান বাজারের গোটা ফুটপাথ জুড়ে পাখির বাজার। ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন ধরনের তারের কি চেরা বাঁশের খাঁচার ভেতর নানা জাতের সব পাখি -- মুনিয়া, সরালে, বুলবুল, টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া ইত্যাদি নিয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে পাখিওলারা। চারপাশে খদ্দেরদের গিসগিসে ভিড়। পাখির দাম নিয়ে দরাদরি, হাঁকাহাঁকি, পাখিদের অবিরাম কিচিরমিচির, এমনি সব আওয়াজে সমস্ত তল্লাট সরগরম। একটা বাজারে যে এত পাখি বিকোয়, ধারণা ছিল না লখিন্দরদের। যত দেখছিল ততই অবাক হচ্ছিল তারা।

বিস্ময় কিঞ্চিৎ থিতিয়ে এলে একজন পাখিওলাকে জিজ্ঞেস করতে সে গণেশ কুণ্ডুকে দেখিয়ে দেয়।

লোকটার বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। সাত ঘাটের জল খাওয়া পেটানো এবং চোয়াড়ে চেহারা। ছড়ানো নাকের তলায় পাকানো গোঁফ। পরনে রঙিন লুঙ্গির ওপর কাজ-করা পাঞ্জাবি। মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি। চোখ দুটো লালচে। গালে দু-তিন দিনের না-কামানো দাড়ি। চৌকো মুখে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা যেন ফুটে আছে। ডান হাতে ঢাউস ঘড়ি আর গলায় সোনার চেইনে বাঘ-নখ ঝুলছে। লোকটা যে খুব সহজ নয়, এক নজরেই টের পাওয়া যায়।

একটা উঁচু প্যাকিং বাক্সর ওপর পা ঝুলিয়ে বসে গাঁজার কল্কের মতো দু হাতে ধরে একটা সিগারেট টানছিল গণেশ কুণ্ডু। তার চারপাশে বশংবদ চামচা জাতীয় কিছু লোক।

গিরীনের মুখে লখিন্দর আগেই শুনেছিল, হাতিবাগানের সব পাখিওলা নাকি তার হাতের মুঠোয়। সে এখানে যা বলবে সেটাই অলিখিত আইন। তার হুকুম অমান্য করার মতো বুকের পাটা কারও নেই।

লখিন্দররা ভয়ে ভয়ে গণেশের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বলে, 'বাবুমাশায়, আপনার সন্‌গে এট্টা কতা আচে।'

নাকমুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে চোখ কুঁচকে গণেশ জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

'আজ্ঞে কুলতলির গিরীন জানা আমাদের আপনার কাচে পাটিয়েচে।'

গিরীনের নামে কিঞ্চিৎ কাজ হয়। কোঁচকানো চোখ স্বাভাবিক করে বলে, 'কী জন্যে পাঠিয়েছে?'

গণেশের সঙ্গী লোকগুলোকে এক পলক লক্ষ করে লখিন্দর অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'সবাইকার সামনে লয়, আলাদা করে বলতে চাই।'

গণেশ প্রায় হুমকে ওঠে, 'কী অমন গোপন কথা হে তোমার যে আড়ালে শুনতে হবে? কনে বৌ নাকি?'

গণেশের সঙ্গীরা খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে।

ঘাবড়ে গিয়ে লখিন্দর বলে, 'না। কতাটা হলে গে—'

লখিন্দর কথা শেষ করতে পারে না, তার আগে চারপাশে সন্ত্রস্ত লোকজনের দৌড়ে ঝাঁপ আর হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। পাখির খাঁচা তুলে নিয়ে দৌড়ে পালাতে পালাতে পাখিওলারা সমানে চেঁচাতে থাকে, 'পালাও পালাও, পুলিশ এসেছে—'

গণেশও বসে থাকে না, এক লাফে প্যাকিং বাক্স থেকে নেমে সামনের দিকে ক'পা এগিয়ে ছোঁ মেরে যতগুলো পারে পাখির খাঁচা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে উল্টোদিকের একটা রাস্তায় ছুট লাগায়। তার মতো আরো সবাই, যে যেদিকে পারছে ছুটছে।

এত লোকের ধাক্কা খেতে খেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে সারী আর লখিন্দর। ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ফের ধাক্কা, আবার ছিটকে পড়া। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটা তারা তবু পড়ে গেলেও উঠতে পারছিল কিন্তু এবার ওঠার আগেই পাখিওলারা তাদের মাড়িয়ে মাড়িয়ে ছুটে যেতে থাকে। নিজেদের বাঁচানোর জন্য হাত দিয়ে মুখ আর বুক আড়াল করে তারা চিৎকার করতে থাকে, 'দেকে চল ভাইরা। আমাদের ওপর দে যেয়ো নি।' অথবা 'কী হল, অমুন দৌড়চ্চ কেন? কী হল গ—বল না?'

কিন্তু উত্তর কে দেবে? ফুটপাথে পড়ে থাকতে থাকতে লখিন্দর আর সারী দেখতে পায় দুটো মস্ত বড় পুলিশ ভ্যান থেকে অনেক কনস্টেবল লাঠি আর বন্দুক হাতে নেমে পাখিওলাদের তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। দু-চারজনকে তারা ভ্যানে টেনেও তোলে, সেই সঙ্গে বেশি কিছু পাখির খাঁচাও। বাকি পাখিওলারা চারদিকের অলিগলিতে ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে।

ধাক্কা খেয়ে বার বার নিচে পড়ার ফলে আর পাখিওলাদের লাথিতে লখিন্দরের ঠোঁট কাঁধ বুক থেঁতলে এবং ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়েছে। সারীর কপালে কালসিটে পড়ে ফুলে উঠেছে।

গোটা পাখির বাজারটা এখন সুনসান হয়ে গেছে। লখিন্দর আর সারী এবার উঠে বসে। গায়ের ধুলো আর রক্ত মুছতে মুছতে লখিন্দর বলে, 'কী দিকদারি বল দিকিন! পাখিওলাদের ওপর পুলিশ কেন যে হুজ্জুতি করল।'

এ প্রশ্নের উত্তর সারীর জানা নেই। সে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে খানিক দূরে রাস্তার একটা জলের কল দেখিয়ে বলে, 'কে জানে কেন। চল, ওখেনে গে রক্তটা ধুয়ে লেবে।'

রক্ত ধোয়া হলে সারী বলে, 'এবেরে কী করবে?'

লখিন্দর বলে, 'যে জন্যি হাতিবাগানে আসা তার তো কিছুই হল না। গণেশবাবুর সন্‌গে সবে কতাটা আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তুন কী বেপদটা ঘটে গেল বল দিকিন।'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে সারী।

লখিন্দর বলে, 'পুলিশ অমুন করে কেন ঝঞ্ঝাট বাধালে আগে সে খপরটা লিই। তারপরে গণেশবাবুকে কুথাও পাওয়া যায় কিনা দেকি।'

পুলিশ ভ্যান চলে গিয়েছিল।

এধারে ওধারে গণেশের খানিকটা খোঁজ করে এবং তাকে না পেয়ে ফের লখিন্দররা পাখির বাজারে চলে আসে। পাখিওলারা কেউ না থাকলেও আশেপাশে জামাকাপড়ের দোকানদারেরা রয়েছে। তাদের একজনের কাছে জিজ্ঞেস করে যা জানতে পারা গেল তাতে ভয়ে দুর্ভাবনায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড় লখিন্দরের। ইদানীং নাকি প্রায়ই পুলিশ পাখির বাজারে হানা দিচ্ছে। পাখি ধরা আর বিক্রি করা এখন বেআইনি। আজকাল যে বাজার বসে সেটা লুকিয়ে-চুরিয়ে। পুলিশ হানা দিলেই পাখিওলারা পালিয়ে যায়।

ভয় পেলেও লখিন্দরের হঠাৎ মনে হয়, লুকিয়ে হলেও পাখির বাজার তো বসছে। বাজার বসলে পাখিরও দরকার। তাই গণেশ কুণ্ডুর সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে।

লখিন্দর দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি গণেশবাবুকে চেনেন?'

দোকানদারটি বলে, 'কোন গণেশবাবু —কুণ্ডু কি?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে এখানকার সব্বাই চেনে।'

'তেনারে কুথায় পাওয়া যেতি পারে?'

'খানিক আগে চোখে পড়ল, গণেশবাবু পুলিশ দেখে উল্টোদিকের রাস্তায় দৌড় মারল। আজ আর এমুখো হবে বলে মনে হয় না।'

'তেনি কুথায় থাকেন বুলতে পারেন?'

'না।'

অগত্যা লখিন্দর সারীকে নিয়ে রাস্তায় নামে। বলে, 'আর এখেনে থেইকে কী হবে?'

স্বামীর কথায় সায় দিয়ে সারী বলে, 'হ্যাঁ, চল—'

হতাশায় মন ভরে গিয়েছিল লখিন্দরের। সে বলে, 'অ্যাত পাইসা খচ্চা করে অ্যাদ্দূর এলুম। কিন্তুন গণেশবাবুর সন্‌গে দেকা হয়েও কাজের কতাটি হল না গ। ভাতের গরাস মুখের কাচে লিয়ে গিয়েও পড়ে গেল।'

'অখুন আর আপসস করে কী করবে? ফের য্যাখন কলকেতায় আসা হবে ত্যাখন দেকা ক'রো।'

'আর কি আসা হবে এ জন্মে!'

কথায় কথায় বড় রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছিল।

সারী শুধোয়, 'এখুন তা হলে কী করবে?'

লখিন্দর বলে, 'কাঁকুড়গাচিতে সার্কেসওলাদের সন্‌গে দেকা করার কতা আচে না?'

'হ্যাঁ।'

'ওখেনকার কাজ মিটতে কতক্ষণ লেইগে যাবে কে জানে। যদিন তাড়াতাড়ি চুইকে ফেলতে পারি, সন্‌ঝের গাড়ি ধরে ঘরে ফিরে যাব।'

'বা রে—'

'কী হল?'

'কলকেতায় এলাম, এট্টা সিনিমা দেকে যাব না?'

একটু ভেবে লখিন্দর বলে, 'তা বটে। আগে সার্কেসওলাদের সন্‌গে কাজটা মিটোই, তারপর সিনিমার কতা ভাবা যাবে।'

আদুরে বালিকার মতো সারী বলে, 'সিনিমা না দেকে আমি ঘরে ফিরচি না।'

## আঠারো

কাঁকুড়গাছিতে লখিন্দররা যখন গ্রেট ইণ্ডিয়া সার্কাস-এর বিশাল তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল, তখনও বেলা তেমন একটা হয় নি। বড়জোর সাড়ে আটটা, ন'টা। শীতকাল বলে রোদটা বেশ ম্যাড়মেড়ে, ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া কলকাতার ওপর দিয়ে এলোমেলো বয়ে যাচ্ছে।

আগে লখিন্দররা খেয়াল করে নি, এবার চোখে পড়ল বড় তাঁবুটার আড়ালে আরো গোটা কয়েক তাঁবু রয়েছে। সেগুলোতে সার্কাসের যাবতীয় জন্তু জানোয়ার—বাঘ, হাতি, সিংহ, কুকুর, ঘোড়া থেকে শুরু করে নানা জাতের পাখি পর্যন্ত রাখা হয়েছে। বাঘ-সিংহগুলোকে বিরাট বিরাট খাঁচায় আটকানো। হাতি ঘোড়া টোড়া খোলা জায়গায় বাঁধা রয়েছে।

সবগুলো তাঁবু ঘিরে উঁচু উঁচু টিনের দেওয়াল। সামনের দিকের সমস্তটা জুড়ে টানা কলাপসিব্‌ল গেট। গেটের মাথায় বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা 'গ্রেট ইণ্ডিয়া সার্কাস।'

গেটটা এক জায়গায় সামান্য ফাঁক করা। সেখানে একটা লম্বা চওড়া লোক টিনের চেয়ারে বসে বাঁ হাতের চেটোয় চুন এবং কুচি কুচি করে কাটা তামাক পাতা ডলে খৈনি বানাচ্ছিল। সে এখানকার দারোয়ান।

লখিন্দরদের দেখে দারোয়ানটা চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'কী চাই ?'

আসার সময় সার্কাসের মালিক পরমেশ্বর মেননের নামটা মনে মনে বার বার আউড়ে মুখস্থ করে রেখেছিল লখিন্দর। ভয়ে ভয়ে বলে, 'পরমেশ্বর বাবুমশায়ের সন্‌গে দেকা কবব।'

লখিন্দরদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নেয় দারোয়ান। এমন আকাট গেঁয়ো একটা লোক সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চায়, এটা তার কাছে একই সঙ্গে কৌতুক এবং বিরক্তির ব্যাপার। জিজ্ঞেস করে, 'মুলাকাত করতে চাইছ কেন ?'

'এই পাখপাখালি লিয়ে এট্টু কতা কইব।'

দারোয়ান বাংলাটা মোটামুটি বুঝতে পারে। বলে, 'পাখপাখালি—মতলব পঞ্ছী।'

'পক্ষী' শব্দটা এই প্রথম শুনল লখিন্দর। আন্দাজে মাথা নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

কি ভেবে দারোয়ান বলে, 'এখুন মালিকের সাথ দেখা হোবে না। তুমরা পরে এস।'

এটা অবশ্য ঠিকই বলেছে দারোয়ান। পরমেশ্বর মেনন টানা দুপুর পর্যন্ত ঘুমোন। তাঁর কাচা ঘুম ভাঙাবার হুকুম নেই, বিশেষ করে একটা গেঁয়ো লোকের জন্য।

হাতজোড় করে লখিন্দর জিজ্ঞেস করে, 'কখুন দেকা হবে?'

'বিকালে এস।'

'বাবুমাশায় দেকবেন বিকেলে ম্যানো তেনার সন্‌গে দেকাটা হয়।'

দারোয়ানটার হয়ত লখিন্দরের ওপর কিঞ্চিৎ করুণাই হল। সে বলে. 'আচ্ছা আচ্ছা বিকেলে এস তো. তখুন দেকা যাবে।'

এরপর লখিন্দররা একটা সস্তা ভাতের হোটেল খুঁজে বার করে খেয়ে নেয়। তারপর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে. কখনও বা ফুটপাতে বসে খানিক জিরিয়ে বিকেলবেলায় আবার 'গ্রেট ইণ্ডিয়া সার্কাস'-এর সামনে চলে আসে।

এখন আর জায়গাটাকে চেনাই যায় না। এই দিনের বেলাতেই চারিদিকে লাল নীল সবুজ ইত্যাদি নানা রঙের আলো জ্বলে উঠেছে। ডান দিকে সারি সারি টিকেট কাউণ্টার। সেগুলোতে লম্বা লম্বা লাইন। মাইকে অনবরত ঘোষণা করা হচ্ছে. খানিক পরেই 'শো' শুরু হবে। লোকের ভিড়. হৈচৈ এবং মাইকের গমগমে আওয়াজে সমস্ত এলাকাটা সরগরম।

লখিন্দররা হকচকিয়ে গিয়েছিল। সারী বলে, 'কী কাণ্ড রে বাবা!'

সেই দারোয়ানটাকে গেটের কাছেই পাওয়া গেল। এখন তার চেহারা অন্য রকম। ওবেলা একটা ধুতি আর হাফ হাতা শার্ট পরে ছিল। এখন তার পরনে ইস্তিরি করা নীল ইউনিফর্ম. হাতে বন্দুক. মাথায় টুপি. গলায় টোটার মালা—একেবারে পাক্কা মিলিটারি ড্রেস।

দারোয়ান লখিন্দরদের দেখামাত্র চিনতে পারল। একটা লোককে ডেকে তার সঙ্গে ওদের পরমেশ্বরের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

সার্কাস দলের সবাই তাঁবুতেই থাকে। সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বাহারি তাঁবুটা পরমেশ্বরের। একটা খাটে কাত হয়ে শুয়ে কি সব কাগজপত্র

দেখছিলেন। লখিন্দরদের পায়ের আওয়াজে কাগজগুলো একধারে সরিয়ে উঠে বসলেন।

ভদ্রলোকের চেহারা একেবারে কালো পাথর কাটা মূর্তির মতো। বিরাট চওয়া বুক। চোখের তারা দুটো বাদামি, নাকের তলায় মোমে-মাজা পাকানো গোঁফ। পরনে ফুল প্যান্ট আর জামার ওপর হাতকাটা সোয়েটার। শরীরের যে অংশগুলো খোলা রয়েছে সেই সব জায়গায় অজস্র আঁচড়ের শুকনো দাগ। তাঁর বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন।

লখিন্দররা জানে না, যৌবনে বাঘের ট্রেনার ছিল পরমেশ্বর। জন্তুগুলোকে তালিম দেবার সময় কত যে আঁচড় কামড় খেতে হয়েছে, হিসেব নেই। সে সবের স্মৃতিচিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে। বাঘ ট্রেনার থেকে ধীরে ধীরে তিনি সার্কাসের দল খুললেন। এখন তো গোটা দেশ জুড়ে তাঁর 'গ্রেট ইণ্ডিয়া সার্কাস'-এর সুনাম।

এমন একটা জবরদস্ত চেহারার লোকের সামনে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল লখিন্দররা। পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'আমার কাছে কী দরকার?' চেহারা যেমনই হোক, গলার স্বরটা কিন্তু বেশ মিষ্টি।

একটু যেন ভরসা পায় লখিন্দর। তারপর হাতজোড় করে তাদের আসার কারণটা জানিয়ে দেয়।

সব শুনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন পরমেশ্বর। তারপর বলে, 'শাসমলবাবুদের সঙ্গে বেইমানি করতে চাইছ?'

লখিন্দর চমকে ওঠে। মাথাটা অনেকখানি নুইয়ে করুণ মুখে বলে, 'আমরা বড্ড গরিব বাবুমশায়, আমরা কারুর সন্‌গে বেইমানি করি না। কিন্তুন পাখির জন্যি শাসমলবাবুদের কাচে যা দাম পাই তাতে আধপেটা খেইয়ে কুনোরকমে বেইচে আচি। দু মুঠো ভরপেট খাওয়ার তরে আপনার কাচে এসিচি। অখুন আপনি দয়া না করলে—'

পরমেশ্বর লোকটি বেশ ধুরন্ধর। বলল, 'তুমি যে লুকিয়ে আমার কাছে এসেছ, শাসমলবাবু জানলে কী হবে?'

ঢোক গিলে ভীরু গলায় লখিন্দর বলে, 'আমাদের বড্ড বেপদ হয়ে যাবে বাবুমশায়। এই ক্ষেতিটা করবেন না, ভগমানের দোহাই। আমার কাচ থিকে পাখি কিনতে হবে না। এই কান মুলচি, নাক মুলচি, আমরা চলে যাচ্চি। আর কখুনও আসব না।'

পরমেশ্বর অবশ্য মনে মনে এর ভেতর হিসেব কষে নিয়েছেন। পাখি বাবদে তিনি যে দাম শাসমলবাবুকে দেন তার আধাআধি দামে এই লোকটার কাছ থেকে পাখি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। শাসমলকে তার আসার কথা জানিয়ে দেবার ভয় দেখালে সে দাম নিয়ে ট্যাঁ ফোঁ করতে পারবে না। লখিন্দরকে হাতে রাখা ভাল।

পরমেশ্বর বলে, 'ঠিক আছে, শাসমলবাবুকে তোমার কথা জানাব না। অত করে যখন বলছ তখন তোমার কাছ থেকে কিছু পাখি নেব। বড় কাকাতুয়া দিতে পারবে?'

লখিন্দর বলে, 'না বাবুমশায়, আমাদের উধারে কাকাতুয়া আসে না।'

'মুনিয়া?'

'না।'

'কোয়েল?'

কোয়েল কথাটার মানে জানে লখিন্দর—কোকিল। সে বলে, 'তা পাওয়া যায়। তবে ফাগুন চোতের আগে মিলবে নি।'

পরমেশ্বর বলেন, 'আমরা ফাগুন পর্যন্ত কলকাতার আশে পাশে খেলা দেখাব। তুমি খোঁজখবর রেখো। কোকিল পেলে দিয়ে যেয়ো।'

'কিন্তুন—'

'কী?'

'শীতের পাখি কিছু লাগবে নি বাবুমশায়?'

'পাখি তো কত রকমই আছে। সব পাখি আমাদের কাজে লাগে না। সার্কাসে যেগুলো দরকার শুধু সেগুলোই কিনি।'

একটু চিন্তা করে লখিন্দর জিজ্ঞেস করে, 'টিয়া—টিয়ার দরকার নেই?'

পরমেশ্বর বলেন, 'হ্যাঁ টিয়া চলবে।'

'এ সময় অনেক টিয়া আসে ওখেনে। ক'টা চাই বলুন—'

'দু'ডজন, মানে চব্বিশটা দিও। ফি পাখির জন্যে পনের টাকা করে পাবে। তা হলে দাম হল তিন শ' ষাট টাকা।' যে দাম পরমেশ্বর দিতে চাইলেন, শাসমলবাবুদের কাছ থেকে কিনতে গেলে তার ডবলেরও বেশি দিতে হত। এই টাকা পেলে লখিন্দর বর্তে যাবে, এদিকে তাঁরও যথেষ্ট লাভ।'

একসঙ্গে এত টাকা পেয়ে যাবে, কল্পনাও করতে পারে নি লখিন্দর। আনন্দ এবং উত্তেজনায় তার মুখ চক চক করতে থাকে। হাত কচলাতে

কচলাতে সে বলে, 'য্যাত শিগগির পারি, পাখি লিয়ে আপনার কাচে আসচি।'

'আচ্ছা। একটা কথা—'

'বলেন বাবুমশায় ?'

'আগাম টাকা কিন্তু পাবে না। আমার নগদ কারবার। এক হাতে পাখি দেবে। আরেক হাতে টাকা গুনে নেবে।'

লখিন্দররা সার্কাসের তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ে।

বিকেলবেলায় পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে ভেতরে ঢুকেছিল। এখন আর দিনের আলো নেই। কলকাতা শহরের ওপর শীতের অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

রাস্তা দিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে হাঁটছিল লখিন্দর আর সারী। সারী বলে, 'এবেরে বড্ড সুক্ষেণে (সুক্ষণে) কলকেতায় এসিচি।'

লখিন্দর তার কথায় সায় দিয়ে বলে, 'যা বুলেচিস! টালিগঞ্জের বাবুমশায় তো আগাম ট্যাকা দিয়ে দিলে। পাখি আনলে পরমেশ্বর বাবুমশায়ও নগদা কিনে লেবেন। ভগমান আমাদের ওপর মুখ তুলে চেয়েচে রে সারী।'

'হ্যাঁ। দুই বাবুমশায়কে হাতে রাকতে হবে। তা হলে অভাব দুঃখু ঘুচে যাবে।'

'হুঁ।'

'গাঁয়ে ফিরে শিগগিরি শিগগিরি পাখি ধরার চেষ্টা কর। অ্যামন সুযুগ ছাড়া যাবে নি।'

'তাই কখুনও ছাড়ি ?'

সারী লখিন্দরের পুরনো প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দেয়। 'বুলেছিলে অনেক ট্যাকাপয়সা পেলে আমায় সোনার হার, চুড়ি, রুলি, ঝুমগো গইড়ে দেবে। ভুলে যাও নি তো ?'

লখিন্দর বলে, 'ভুলে যাব ক্যানো ? হার-চুড়ি-ফুড়ি সব পাবি। এখুন খালি ভগমানকে ডাক, ফির গে য্যানো দেকি বাদা আর বিল পাখিতে পাখিতে ভরে গেচে।'

'সব সময়ই তো ডাকচি। টিরেনে করে আসার সোমায় কী দেকলে ? পাখির ঝাঁক আমাদের উধারে উড়ে যাচ্ছিল না ? বাড়ি ফিরে দেকব ভগমান তুমার আশাটা পুন্ন করে দেচে।'

লখিন্দর আকাশের দিকে মুখ করে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে অদৃশ্য ঈশ্বরের উদ্দেশে বিড় বিড় করে প্রার্থনা জানায়, ক'টা বছর বড় কষ্টে কেটেছে, এবার যেন সব দুঃখ ঘুচে যায়। তারপর সারীর দিকে ফিরে বলে, 'দুটো বড় বড় কাজ হল। কাল পাখির বাজারে গে গণেশ বাবুর সন্‌গে দেকা করে দুকুরে কুলতলির গাড়ি ধরব।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় সারী ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, 'ত্যাখন কী কতা হল?'

চকিত হয়ে লখিন্দর শুধোয়, 'কী কতা?'

'সিনিমার বই দেকাবে বলেছিলে। কলকেতায় শুনিচি রাত্তিরেও বাইস্কোপ দেকায়। চল না গ, এট্টা দেকি।'

মন মেজাজ আজ খুব ভাল লখিন্দরের। বলে, 'ঠিক আচে। রাত্তিরটা য্যাখন এখেনে থাকতেই হবে, 'বই' দেকে খানিকটা সময় কেটিয়ে দেওয়া যাক।'

## উনিশ

খুঁজে খুঁজে একটা সিনেমা হল বার করে ফেলে লখিন্দররা এবং টিকেট কেটে ভেতর ঢুকেও পড়ে।

ছবিটায় প্রচুর মারদাঙ্গার সঙ্গে রয়েছে দুরন্ত প্রেমকাহিনী। দেখতে দেখতে চোখের পাতা পড়ছিল না সারীর। বিশেষ করে নায়িকার (বিরাট ধনীর মেয়ে) বাড়িঘর আর দুর্দান্ত সব পোশাক-আশাক, গয়না, গাড়ি-টাড়ি দেখে সে একেবারে চমৎকৃত।

পাশে বসা লখিন্দরের কনুইয়ের কাছে একটু ঠেলা দিয়ে আচ্ছন্নের মতো সারী বলে, 'বাড়িখানা দেকেচ!'

লখিন্দর বলে, 'হুঁ—'

'আমরা যদিন ঐরকম বাড়িতে থাকতে পেতম আর অ্যামন দামি দামি শাড়ি পরতে পেতম—'

'এ জম্মে লয় রে। অনেক ভাগ্যি করতে হয়, তবে অ্যামন বাড়িতে থাকা যায়।'

সারী সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলে না, শুধু বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বেশ খানিকক্ষণ পর বলে, 'অ্যামনটা না হোক ষ্যামন আচি তার থিকে তো আরেট্টু ভাল থাকা যায়।'

'ভাল থাকব বলে তো কষ্ট কইরে কলকেতায় আসা।'

সিনেমা হল থেকে বেরুতে রাত হয়ে যায়। রাস্তায় লোকজন এবং গাড়ি-টাড়ি বেশ কমে গেছে।

লখিন্দর বলে, 'আগে কুথাও খেয়ে লেওয়া যাক। তারপর দেকি বাকি রাতটা কুথায় কাটানো যায়।'

সিনেমা দেখার পর স্বপ্নবৎ ঘোরের মধ্যে রয়েছে সারী, সে উত্তর দেয় না। ক'পা এগুতেই ফুটপাথের এককোণে ছোটখাট ভিড় চোখে পড়ে। একটা মাঝবয়সী পশ্চিমা মেয়েমানুষ বড় উনুনে রুটি সেঁকচে আর বয়স্ক একটি লোক ব্যস্তভাবে কী যেন করছে। জমায়েতটা তাদের ঘিরে।

কাছে আসতে দেখা গেল বয়স্ক লোকটি শালপাতায় গরম গরম রুটি আর বড় ডেকটি থেকে আলু কুমড়োর ছোঁকা তুলে চারপাশের লোকেদের হাতে হাতে দিচ্ছে। কারও খাওয়া শেষ হলে হিসেব করে দাম গুনে নিচ্ছে

লখিন্দর সারীকে বলে, 'এখানেই খেয়ে লেওয়া যাক, কি বুলিস ?'

সারী বলে, 'হুঁ—'

খাওয়া দাওয়ার পর এধারে ওধারে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এক জায়গায় একটা পরিত্যক্ত চালার নিচে এসে দু'জনে বসে। যেদিকে চোখ যায়, দু-একটা কুকুর ছাড়া সব সুনসান। রাস্তায় কর্পোরেশনের টিউব লাইট জ্বলছে। দূরে বড় বড় বাড়ির বন্ধ কাচের জানালায় আলোর আভাস।

শীতের এই রাতে শরীর উত্তপ্ত রাখার জন্য লখিন্দর আর সারী গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘন হয়ে বসেছে।

লখিন্দর বলে, 'অচিনা জায়গা। দু'জনার একসনগে ঘুমিয়ে কাজ লেই। কখুন কী ঝঞ্ঝাট এইসে পড়বে, কে জানে। তুই আগে ঘুমিয়ে লে, পরে আমি ঘুমুব।'

অর কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দে চমকে ওঠে লখিন্দররা। তিনটে চোয়াড়ে বদ ধরনের লোক চোখের পলকে এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের নজর সারীরে দিকে।

প্রথমটা ভীষণ ভয় পেয়ে যায় লখিন্দর। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'কী চাও তুমরা ?'

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একজন সারীকে বলে, 'অ্যাই, তুমি এস আমাদের সঙ্গে।'

লখিন্দর চেঁচিয়ে ওঠে, 'কেন যাবে, অ্যাঁ? কে তুমরা?'

আরেকটা লোক ফস করে ছোরা বার করে চাপা গলায় হমকে ওঠে, 'চোপ শালা! লাশ ফেলে দেব—'

অন্য লোক দুটো ওদিকে সারীর হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে।

সারী ভয়ার্ত সুরে চেঁচায়, 'বাঁচাও, আমারে বাঁচাও—'

লখিন্দরের ওপর অলৌকিক কিছু যেন ভর করে। সে এক ধাক্কায় ছোরা হাতে লোকটাকে ফুটপাথে ফেলে দিয়ে অন্য লোক দুটোর মুখে সমস্ত শক্তিতে আচমকা কীল বসিয়ে সারীর হাতে ধরে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে।

ঐ রকম একটা গেঁয়ো লোক যে তাদের এভাবে কাবু করে ফেলবে, ভাবতে পারে নি তিন বদমাশ। প্রথমটা তারা হকচকিয়ে যায়, তারপর লাফ দিয়ে উঠে লখিন্দরদের পিছু নেয়।

এ রাস্তায় সে রাস্তায় ছোটাছুটি করতে করতে এক জায়গায় এসে লখিন্দররা দেখতে পায়, কর্পোরেশনের স্তূপীকৃত বাহাত্তর ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ প্রায় আধ মাইল এলাকা জুড়ে পড়ে আছে। লখিন্দররা নিরুপায় হয়ে পাইপের ভেতর ঢুকে যায়। তারপর এক পাইপ থেকে আরেক পাইপে—এইভাবে বহুদূরে চলে যায়। বদমাশরা আর তাদের খোঁজ পায় না।

শেষ পর্যন্ত নানা ধকলের পর একটা পাইপে জড়াজড়ি করে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর কখন রাত কেটে গেছে, কখন রোদ উঠেছে তারা জানে না।

অনেক বেলায় লখিন্দরদের ঘুম ভাঙে। পাইপ থেকে বেরিয়ে দু'জনে রাস্তার কলে মুখ ধুয়ে নেয়। তারপর একটা খাবারের দোকানে গিয়ে শালপাতার ঠোঙায় কচুরি সিঙাড়া এবং জিলিপি খেতে খেতে লখিন্দর বলে, 'কী বেপদটাই না গেল কাল! আরেট্টু হলে তোরে হারাতাম।'

সারী অস্পষ্ট গলায় বলে, 'হুঁ।'

লখিন্দর আবার বলে, 'কলকেতায় য্যামন মদু (মধু) আচে তেমনি ঝামিলাও কম লেই রে।'

শহরের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় ভিড় বাড়ছে। ট্রাম বাস মিনি অটো ঘন্টি বা হর্ণ দিতে দিতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

হঠাৎ দেখা গেল একটা লোক মই কাঁধে করে দেওয়ালে দেওয়ালে সিনেমার পোস্টার সাঁটছে। পোস্টারগুলোতে লাস্যময়ী নায়িকার মুখ। সারী জ্বলজ্বলে চোখে পোস্টার দেখতে দেখতে বলে, 'বেপদ আচে ঠিকই, তবে মদুটাই বেশি গ। দ্যাকো দ্যাকো, কী সোন্দর উই মেইয়েটা। কী 'বই', লোকটারে শুদোও না—'

লখিন্দর বলে, 'বই মাতায় থাক। এখুন হাতিবাগানে চ। গণেশ বাবুর সন্‌গে দেকা হলে তো ভাল, লইলে ওখেন থিকে সিদে হাওড়া ইস্টিশেন।'

হাতিবাগানে এসে গণেশ কুণ্ডুর খোঁজ পাওয়া গেল না। সেই যে পাখির বাজারে কাল পুলিশ হানা দিয়েছিল আর গণেশ উত্তর কলকাতার অলিগলি দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল তারপর আর সে ও ধার মাড়ায় নি।

আর পাখিওলাদের একজনকেও দেখা গেল না। কাটা কাপড় বা বাসনকোসনের দোকানীদের জনে জনে জিজ্ঞেস করেও গণেশের হদিস পাওয়া গেল না। এমন কি সে কোথায় থাকে, তা-ও কেউ বলতে পারল না।

অগত্যা লখিন্দররা হাওড়া স্টেশনে চলে আসে।□

## কুড়ি

কলকাতা থেকে কাল সন্ধেয় গাঁয়ে ফিরে এসেছিল লখিন্দররা। এসেই রান্না চড়িয়ে দিয়েছিল সারী। শরীরের ওপর দিয়ে ক'দিন খুব ধকল গেছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ওরা শুয়ে পড়েছিল। নিজের বাড়ি বলে কথা। তার আরামই আলাদা। শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ জুড়ে এসেছিল।

টানা ঘুমে রাত কাবার করে লখিন্দর সকালে উঠে মুখ ধুয়ে একপেট বাসি ভাত খেয়ে পাখি ধরার সরঞ্জাম নিয়ে ভূষণের বাড়ি চলে আসে। তাকে সঙ্গে করে বাদার দিকে হাঁটিতে থাকে।

শীতের নিরুত্তাপ রোদ ফাঁকা শস্যহীন মাঠ আর দূরের গাছপালার মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে। কাল রাতে যে ঘন কুয়াশা পড়েছিল এখনও তার খানিকটা দিগন্তের গায়ে আবছাভাবে লেগে আছে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভূষণ শুধোয়, 'এট্টা কতার ঠিক জবাব দে দিকিন।'

লখিন্দর বলে, 'কী কতা ?'

'তুই আর তোর বউ কুথায় গেচিলি ?'

লখিন্দর চকিতে ঘুরে ভূষণের দিকে তাকায়। বলে, 'হঠাৎ এ কতা ?'

ভূষণ বলে, 'লোকে একেক রকম কতা কইছেল। কেউ বুললে তোর শ্বউরবাড়ি গেচিস, কেউ বুললে কলকেতায়। আমরা তো ধন্দে পড়ে গেলাম। তাই তোরে শুদোচ্চি।'

লখিন্দরের পেটে এমনিতে কথা থাকে না। ভূষণের সরাসরি এ রকম প্রশ্নে সে একটু হকচকিয়ে যায়। কলকাতার কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা, বুঝে উঠতে পারছে না।

ভূষণ এবার তাড়া লাগায়, 'কি হল, মুখ বুজে রইলি যে ?'

শেষ পর্যন্ত দ্বিধান্বিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে লখিন্দর বল, 'তুমি কাউরে বুলে দেবে না তো ?'

'না, বুলব না।'

'আমরা কলকেতাতেই গিচিলাম।'

'কেন, দরকার ছিল ?'

লখিন্দর ভূষণকে বিশ্বাস করে। সে যখন গোপন রাখবে বলেছে নিশ্চয়ই পাঁচ কান করবে না। লখিন্দর কলকাতায় যাবার কারণটা এবার জানিয়ে দেয়।

ভূষণ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, 'কাজ কিচু হল ?'

লখিন্দর বলে, 'এই ধর গে, পুরোটা হয় নি। আধাআধি মতো হয়েচে।'

'কি রকম ?'

কলকাতায় গিয়ে কার কার সঙ্গে দেখা করেছে, তাদের সঙ্গে কী কী কথা হয়েছে, সব আস্তে আস্তে বলে যায় লখিন্দর।

ভূষণ বলে, 'খুব ভাল করিচিস। ঐ শাসমলবাবু আমাদের সব্বোনাশ করে ছাড়বে। বুক ঠুকে যে গিচিস, এতে এট্টা কাজের কাজ হল।'

'আমারও তাই মনে হচ্চে। এখন কপাল।'

'আমার এট্টা উবগার (উপকার) করবি ?'

'কী ?'

ভূষণ ব্যগ্র সুরে বলে, 'রাজারামবাবু আর সার্কেসওলাদের কাচে আমার দু-চারটে পাখি বেচার ব্যবোস্থা করে দিবি?'

সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে, আর এই পাখি ধরার কাজেও তারা পাশাপাশি রয়েছে। ভূষণ যদি দুটো পয়সা পায় তার আপত্তির কারণ নেই, বরং সে খুশিই হবে।

লখিন্দর বলে, 'নিচ্চয় করব। আর—'

'আর কী?'

'আমি য্যাখন আবার কলকেতায় যাব, তুমারে সন্‌গে নেব। রাজারাম বাবুমশায় আর সার্কেসের বাবুটির সন্‌গে দেকা করিয়ে দেব। ওনারা য্যাখন য্যাখন 'অডার' দেবে পরে অ্যামন অ্যামন পাখি দিয়ে এস।'

কৃতজ্ঞ ভূষণ লখিন্দরের হাত ধরে বলে, 'ভগমান তোর ভাল করবে লখা। ক'বচ্ছর কী কষ্টেই না কাটচে! পাখির জন্যি কলকেতার বাবুমশায়দের কাচ থিকে দুটো পয়সা বেশি পেলে পেট ভরে খেয়ে বেঁচে যাব।'

লখিন্দর কথা বলছিল ঠিকই কিন্তু তার চোখ বার বার আকাশের দিকে চলে যাচ্ছিল। মাথার ওপর যতদূর চোখ যায়, সব ধু ধু, কোথাও একটা পাখির পালক পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। মনে মনে সে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ভূষণের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'এবেরে আসল কতাটা বল দিকিন কাকা—'

'কী কতা?'

'পাখির খপর কি?'

'কুনো খপর লেই।'

'কিন্তুন—'

দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে লখিন্দরের দিকে তাকায় ভূষণ।

লখিন্দর বলে, 'সিদিন য্যাখন কলকেতায় যাচ্চিলাম চোকে পড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ইদিক পানে আসচে। আমি তো ভাবলম ফিরে এসে দেকব পাখিতে পাখিতে চারদিক ভরে গেচে।'

ভূষণ ম্লান মুখে বলে, 'এট্টা পাখিও এখেনে আসে নি রে লখা।'

কথাটা যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না লখিন্দর। জিজ্ঞেস করে, 'আমি যে দুটো দিন কলকেতায় ছিলম, তার ভেতরে তুমি বিলে গেছেলে?'

'রোজ। না গেলে খেয়েচি কী?'

'পাখি দেকো নি?'

'ঐ দু-চারটে। তুই য্যামন দেকে গিয়েচিলি তার বেশি একটাও না।'

বুকের মধ্যেটা ধক করে ওঠে লখিন্দরের। ট্রেনের কামরা থেকে এদিকে উড়ে আসা পাখির ঝাঁক দেখে কী আনন্দই না হয়েছিল তার। মনে হয়েছিল, ভগবান একবার মুখে তুলে চেয়েছেন। কিন্তু ভূষণ যা বলছে তাতে ভীষণ দমে যায় সে। ভীত সুরে জিজ্ঞেস করে, 'তা হলে ঐ পাখিগুলোন গেল কুথায়?'

'কে জানে, অন্য কুনো দিকে চলে গেচে বুঝিন।'

'পাখি আসে নি, ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে যে গ কাকা, বড্ড বেপদ হল—'

'বেপদ বলে বেপদ।'

'এখুন কী হবে? খাব কী?'

ভূষণ ভরসা দেবার সুরে বলে, 'পাখি আসার সোময় এখুনও যায় নি। মনে হয় এসে যাবে।'

লখিন্দর উত্তর দেয় না।

বিলে এসে ওরা দেখতে পায় চারপাশের গাছের মাথায় দু-চারটে সরালে এবং বুনো টিয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। অর্থাৎ সঠিক খবরই দিয়েছে ভূষণ, সেই পাখির ঝাঁকগুলো এদিকে আসে নি।

আজ আর গাছের মাথায় উঠে কিংবা নিচে মাটিতে পাখি ধরা ফাঁদ পাতে না লখিন্দর। নিজের সারা গায়ে গাছের সরু সরু ডাল আর লতা এমনভাবে বাঁধে যাতে তাকে ঝোপের মতো দেখায়। সেই অবস্থাতেই সে খুব ধীরে ধীরে বিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায় আর টিয়ার ডাক নকল করে টুই টুই করে ডাকতে থাকে। পাখি ধরার এ এক অভিনব পদ্ধতি। ডাক শুনে বিভ্রান্ত টিয়ারা যখন তার গায়ে এসে বসবে তখন হাত বাড়িয়ে বা ছোট জাল দিয়ে টপ করে ধরে ফেলবে সে।

ভূষণের কিন্তু টিয়া ফিয়ার দিকে আপাতত মন নেই। কেননা যে দু-চারটে পাখি গাছের মাথায় বসে আছে সেগুলোকে ধরতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। তার চেয়ে জঙ্গল থেকে মেটে আলু, কচু, কচ্ছপ বা বুনো ফলটল জোগাড় করা অনেক সহজ। ভূষণ তাই জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

সারাটা দিন, প্রায় সন্ধে পর্যন্ত ঝোপ সেজে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মাত্র দুটো টিয়া এবং একটা সরালে ধরতে পারে লখিন্দর। ভূষণ অবশ্য প্রচুর মেটে আলু আর চালতা পেয়েছে।

ঘরে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায় লখিন্দরের। দাওয়ায় একটা কালি-পড়া হেরিকেন ধরিয়ে চাদরে গা ঢেকে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে চুপচাপ বসে ছিল সারী। লখিন্দরকে দেখে মুখ তুলে বলে, 'কি গ, পাখি টাখি ক্যামন পেলে?'

পাখি ধরার সাজ সরঞ্জাম দাওয়ার একধারে নামিয়ে রাখে লখিন্দর। যে দুটো সরালে আর একটা টিয়া ধরতে পেরেছিল সেগুলোকে খাঁচায় পুরে এনেছে। খাঁচাটা তুলে ধরে বলে, 'এই যে—'

সারী বলে, 'মোটে তিনটে!'

'হ্যাঁ।' ক্লান্তভাবে দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসতে বসতে লখিন্দর বলে।

'চৌপর দিন বিলে বাদায় ঘুরে ঘুরে মাত্তর তিনটে পাখি!'

'কী করব, পাখি না পাওয়া গেলে?'

'কলকাতায় যাবার দিন অত পাখি ইদিকে আসতে দেখলম। তারা সব গেল কুথায়?'

'তারা ইদিকে আসে নি।'

## একুশ

দিন কাটতে থাকে।

সেই যে লখিন্দররা কলকাতায় গিয়েছিল তারপর মাসখানেক পার হতে চলল। মাঘ শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু শীতের পাখি আর পরদেশি টিয়ারা এখনও আসে নি। এদিকে গিরীন, সারী আর রাজারামবাবুর কাছে থেকে পাওয়া টাকা ফুরিয়ে এসেছে।

লখিন্দর একেবারে ভেঙে পড়েছে। পাখপাখালি আসছে না, তাই বিলে যেতে ইচ্ছে করে না তার। ইদানীং হতাশভাবে প্রায় সারাদিন বারান্দায় খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে থাকে, নইলে একা একা উদ্দেশ্যহীনের মতো এধারে ওধারে ঘুরে বেড়ায়।

এদিকে কলকাতা থেকে ফেরার পর বেশ কিছুদিন শরীর মেজাজ খুব ভাল ছিল সারীর। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল

সে। কিন্তু লখিন্দর পাখি-টাখি ধরে আনতে পারছে না. এতে সে যেমন চিন্তিত তেমনি বিরক্তও।

একদিন সারী লখিন্দরকে বলে. বসে বসে গিরীনদাদার ট্যাকা. আমার ট্যাকা আর রাজারামবাবুর ট্যাকাটা খেলে। অখুন সোমসার চলবে কী করে? এখেনে ওখেনে ঘুরে বেড়ালে কি ঘরে বসে রইলে কেউ এসে ট্যাকা দে যাবে?'

লখিন্দর বিপন্ন মুখে বলে, 'পাখি না এলি বিলে ঘুরে ঘুরে কিচু লাভ আচে?'

সারী মুখ ঝামটা দেয়. 'তুমার মত ম্যাদামারা ব্যাটাছেলে আমি বাপের জম্মে দেখি নি।'

লখিন্দর উত্তর দেয় না।

সারী থামে নি. সমানে গজ গজ করে. 'পয়সা কামাইয়ের উয্যুগে (উদ্যোগ) লেই। কুঁড়ের হদ্দ। তুমার বাপু রাজার ঘরে জম্মো লেওয়া উচিত ছেল. পায়ের ওপর পা তুলে বসে খেতে পারতে।'

লখিন্দর যে কলকাতা থেকে ফেরার পর পাখির জন্য বিলে বাদায় উদয়াস্ত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে সে কথাটা বেমালুম ভুলে গেছে সারী। প্রাণপাত করেও পাখি না পেলে লখিন্দর কী করতে পারে? এটা এখন কিছুতেই বোঝানো যাবে না সারীকে. তাই সে চুপ করে থাকে।

সারী এবার বলে, 'পাখি আমাদের ইদিকে আসে নি বলে আর কুথাও গিয়ে যে বসবে না, অমুন মাতার দিব্যি দিয়েচে নাকিন?'

সারীর কথায় মনে পড়ে যায়. এখান থেকে মাইল পাঁচেক পূবে আরেকটা বিল আছে। সেখানেও কোনও কোনও বার শীতের পাখি আসে। সে বলে, 'ঠিক আছে. কাল একবার বিলে যাব।'

সারী বলে, 'যেখেনে ইচ্চে যেও। কিন্তুন এট্টা কতা পষ্ট করে শুনে রাখ—'

'কী?'

'দিনের পর দিন উপোস দে আমি কিন্তুন তুমার সোমসার করতে পারব না।'

পর পর ক'দিন পূবের বিলে গিয়েও কাজ কিছু হল না। এবছর সেখানেও পাখি আসে নি।

# বাইশ

লখিন্দর জানে না, নটবর আগাগোড়া তাদের দিকে নজর রেখে যাচ্ছিল। এমনকি তারা যে কলকাতায় গিয়েছিল সে খবরটাও কিভাবে যেন যোগাড় করে ফেলেছে।

একদিন লখিন্দর যখন পুবের বিলে গেছে সেই সময় সেজেগুজে, জামাকাপড় থেকে সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে নটবর তার বাড়ি এসে হাজির। সারী দাওয়ায় বসে আনাজ কুটছিল। নটবরকে দেখে সে অখুশি হয় না। একখানা কাপড়ের আসন পেতে দিয়ে বলে, 'অ্যাদ্দিন পর কী মনে করে?'

নটবর জুত করে বসে বলে, 'মাঝখানে এসিচি, কিন্তুন তুমার দেখা পাই নি।'

বেশ অবাক হয়েই সারী শুধোয়, 'কবে আবার এলে গ?'

'লখিন্দর লোকের চোখে ধুলো দে তুমায় নে কলকেতায় গেল, অথচ ইস্টিশানে দেকা হতে আমায় বুললে তুমি নাকিন ঘরেই থাকবে। আমি দু দিন ঘুরেও গেচি। কুথায় কে? ঘর তালাবন্ধ। বোকা বানিয়ে দেছে গ!'

সারী ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করে নষ্টামির হাসি হাসতে হাসতে বলে, 'আমায় না পেয়ে মন খারাপ হয়েছেল বুঝিন?'

'এট্টু যে হয় নি তা বুলব নি।' বলে ঘাড় কাত করে হাসে নটবর।

'পাহারাদার লেই। কী একখানা সুযুগই না লষ্ঠ হয়ে গেল!' বলে জিভের ডগায় চুক চুক করে আক্ষেপসূচক একটু আওয়াজ করে সারী।

নটবর হেসে হেসে বলে, 'যা বুলেচ! তা কলকেতায় যে কাজে গিয়েচিলে সিটি হয়েচে?'

সারী চমকে ওঠে, 'কী কাজে গেচলাম তুমি জানো নাকিন?'

'তা আর জানি নে? ভয় লেই, আমি কারাক্কে কইব নি। যাদের সন্‌গে দেকা করলে তারা বেশি দর দে পাখি কিনবে তো?'

'তুমি এ সব জানলে কুত্থেকে?'

'আমার দশ জোড়া চোক গ মেইয়ে মানুষ। বিশখানা চোককে ফাঁকি দে তুমরা কিচু করতে পারবেনি, এই কতাখানা মনে রেখ।'

সারী বলে, 'ভাল দর তো দিতে চাইচে কিন্তুন এ বছর পাখপাখালি কুথায়? সোময়টা আমাদের বড্ড খারাপ পড়েচে গ।'

নটবর আচমকা একতাড়া নোট পকেট থেকে বার করে সারীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'এগুলোন ধর—'

সারী বলে, 'না না, ট্যাকা দিও নি।'

নটবর বোঝাতে থাকে, 'আরে বাপু, ধরই না—'

সারী দু হাত নেড়ে না না করে।

নটবর বলে, 'পাখি আসে নি, সে কতা তো পেট মানবে নি।'

সারী চুপ করে থাকে।

নটবর আবার বলে, 'খেতি তো হবে, নাকিন?'

সারী এবারও নিরুত্তর।

নটবর বলে, 'লখিন্দর রোজগারপাতি করুক, ত্যাখন না হয় ট্যাকাটা ফিরিয়ে দিও।'

সারী বলে, 'এর আগেও কত ট্যাকা দিয়েচ, গয়না দিয়েচ। লোকে কী বলে শুনেচ? আমার দুন্নামে কান পাতা দায়।'

সারীর গাল টিপে দিয়ে জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করে নটবর। বলে, 'দুন্নাম ম্যানো কত গেরাহ্যি কর তুমি!'

হেসে হেসে সারী বলে, 'তুমি বড্ড খারাপ লোক গ!'

'তাই নাকিন? কী করে বুজলে?'

'আমারে লতুন করে ফাঁদে ফেলতি চাও।'

নটবর বলে, 'আহা, ফাঁদ বুলচ কেন? বেপদের দিনেই তো লোকে পাশে এসে দাঁড়ায়। আচ্ছা চলি গ!'—বলে আচমকা একটি কাণ্ড বাধিয়ে বসে। সারীকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে একের পর এক চুমু খেতে থাকে।

প্রথমে নটবরকে ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল সারী কিন্তু প্রতিরোধের ক্ষমতা তার লুপ্ত হয়ে যায়।

## তেইশ

সেই যে সারী গালমন্দ করেছিল তারপর থেকে ভূষণের সঙ্গে আবার বিলে এবং বাদায় যেতে শুরু করেছে লখিন্দর।

পরমেশ্বরকে সে বলে এসেছিল ফাল্গুন মাসে দু ডজন টিয়া দিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর গোটা দশেক ধরতে পেরেছে। সেগুলো আর শাসমলের কাছে নিয়ে যায় নি। নিজের ঘরেই খাঁচায় রেখে

দিয়েছে। খুব যত্ন করে সে তাদের দানা খাওয়ায়। সে নিশ্চিত টিয়াগুলো দিয়ে আসতে পারলে আবার নতুন অর্ডার পাওয়া যাবে।

অবশ্য এর মধ্যে লখিন্দর কিছু সরালে, শালিক এবং মাছরাঙা ধরতে পেরেছিল। সেগুলো সে শাসমলবাবুর আড়তে দিয়ে এসেছে। এদিকে তার বাড়িতে নটবরের আসা-যাওয়া ফের বেড়েই যাচ্ছিল। এই ব্যাপারটা নিয়ে গাঁয়ে অনেকদিন ধরেই কানাঘুষো চলছিল। এবার সেটা লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

বিলে যাবার পথে একদিন ভূষণ তাকে বলে, 'তুর মাগ এ কী কাণ্ড বেধিয়েছে বল দিকিন ?'

ভূষণ কী বোঝাতে চায় সেটা লখিন্দরের কাছে জলের মতো স্পষ্ট। সে চুপ করে থাকে।

ভূষণ বলে, 'কারো কাচে মুখ দেকাবার আর জো রইল নি। তুকে আগেও হুঁইশার করে দিয়েছিলাম, কুনো ব্যবোস্থা করিস নি। উই শালো গুয়োর ব্যাটা নটবর আগে লুকিয়ে চুরিয়ে চোরের মতো আসত, এখুন দিনদুকুরে সবার সামনে সে তুর মাগের কাচে আসচে। এই খপরটা কি তুই রাখিস ?

আস্তে আস্তে মাতা নাড়ে নটবর।

ভূষণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উত্তেজিতভাবে এবার বলে, 'হারামজাদার পোয়ের নাথি মেরে দাঁত ভেঙে দে। না পারিস তো বল, গাঁয়ের সবাই মিলে ও শালোর গা থিকে চামড়া খুলে লিই।'

বরাবর লখিন্দরের যা মনে হয়েছে, এবারও তাই হয়। ভাবে ভূষণ যা বলেছে সেটা করে বসবে। একটা লুচ্চা কুকুর তার বৌকে নিয়ে মজা লুটছে, এই চিন্তাটা তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পরক্ষণে মনে হয়, সারীর একটা সাধও তো সে মেটাতে পারে নি। এই চিন্তাটা তাকে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে ফেলে। নিস্পৃহ সুরে লখিন্দর বলে, 'মেইয়ে মানুষ লষ্ট হতে চাইলে কেউ কি তারে ঠেকাতে পারে ? ছাড়ান দ্যাও উ কতা—'

এরকম উত্তরে খুশি হয় না ভূষণ। ভীষণ রেগে গিয়ে সে বলে, 'তুই পুরুষ মানুষ না কী ? মনে হচ্ছে এট্টা কেঁচো—'

জবাব দেয় না লখিন্দর; আকাশের দিকে মুখ তুলে পাখি খুঁজতে শুরু করে।

এইরকম যখন হাল সেইসময় একদিন সারীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে যায় লখিন্দরের। প্রেমিকের টাকায় এমন অপদার্থ স্বামীকে সে খাওয়াতে রাজি হয়। মুখে এই কথাগুলো না বললেও ঝগড়ার কারণটা আসলে এই রকমই।

একে পাখি আসছে না, রোজগার নেই, প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছিল লখিন্দর। এমনিতে সে ঠাণ্ডা মানুষ কিন্তু সেদিন সারীর গঞ্জনায় তার মাথার ঠিক ছিল না, চিৎকার করে বলেছিল, 'ছেনাল মাগী, তুকে আমি শ্যাষ করে ফেলব।' তারপর হিতাহিতজ্ঞানশূন্যের মতো স্ত্রীর চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে ফেলে এলোপাথাড়ি কীল চড় ঘুষি চালিয়ে তার নাকমুখ ফাটিয়ে রক্তারক্তি বাধিয়ে দেয়।

## চব্বিশ

পরদিন মারাত্মক ঘটনাটি ঘটল।

সকালে উঠে সারীর সঙ্গে একটি কথাও না বলে, খালি পেটে বেরিয়ে যায় লখিন্দর।

ভূষণের সঙ্গে সারাদিন বিলে ঘুরে ঘুরে দু-চারটে পাখিও ধরে সে। তারপর সন্ধের আগে আগে বাড়ি ফিরতেই দেখে ঘরের দরজা হাট করে খোলা—সারী নেই।

লখিন্দরের মন গভীর উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে। অন্যদিন বাড়ি ফিরলে দেখা যেত, সারী দাওয়ায় বসে আছে। আজ কোথায় যেতে পারে সে? প্রথমটা ঘরের ভেতর ঢুকে, তারপর বাইরে এসে চারপাশে খোঁজাখুঁজি করে লখিন্দর। গলা চড়িয়ে ডাকাডাকি করতে থাকে—কিন্তু সারীর সাড়াশব্দ নেই।

সারীকে তার স্বভাবের জন্যে গাঁয়ের কেউ পছন্দ করে না। সারীও পারতপক্ষে তাদের ধারে কাছে ঘেঁষে না। যদি কোনও কারণে সে গ্রামে গিয়ে থাকে এই ভেবে লখিন্দর সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে যায়।

গাঁয়ে ঢুকতেই দেখা যায়, পুরুষ এবং মেয়ে-বৌরা এখানে ওখানে থোকায় থোকায় জড়ো হয়ে উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলাবলি করছে। লখিন্দরকে দেখে তারা অদ্ভুত চোখে তাকায়।

লখিন্দর উদ্‌ভ্রান্তের মতো লোকজনকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমরা সারীকে দেকেচ?'

কেউ উত্তর দেয় না।

লখিন্দর বার বার জিজ্ঞেস করার পর একজন মাঝবয়সী লোক কাছে এগিয়ে আসে। তার নাম পশুপতি। সে বলে, 'মন খারাপ করিস নি লখা, তুরে এট্টা মোন্দ খবর দিচ্চি।'

দম-আটকানো গলায় লখিন্দর জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'তুর বৌ দুকুরবেলা ঐ শালো লটবরের সন্‌গে চলে গেচে।'

লখিন্দরের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন থমকে যায়, তারপর প্রবল বেগে লাফাতে থাকে। তার মাথাটা ভেঙে বুকের ওপর ঝুলে পড়ে। সে জানত সারীর স্বভাব খারাপ। নিজের সুখ, সাজগোজ ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারত না। ভাল খাব, ভাল পরব, বড় বাড়িতে থাকব—সারাক্ষণ এ সবেরই স্বপ্ন দেখত। নটবরের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা অজানা ছিল না লখিন্দরের। তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়াঝাটিও হয়েছে, তবু এভাবে সারী যে পালিয়ে যাবে, এটা ভাবতে পারে নি সে।

ক্লান্ত, এলোমেলো পা ফেলে ফের নিজের ঘরে ফিরে আসে লখিন্দর। সর্বস্বান্তের মতো দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে থাকে। নিজের অজান্তেই তার চোখ থেকে জলের ধারা নামে।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল খেয়াল নেই লখিন্দরের। হঠাৎ তার চোখে পড়ে আকাশ প্রায় ঢেকে দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বিলের দিকে চলেছে। এ বছর এই প্রথম শীতের পাখি এল এ অঞ্চলে। ওরা যে সামনের বিলের দিকে যাচ্ছে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

লখিন্দরের রক্তের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে যায় যেন। আকাশের দিকে পলকহীন তাকিয়ে শিরদাঁড়া টান টান করে বসে থাকে সে।

## পঁচিশ

কলকাতায় সেই দুই শিকারী হিরণ্ময় এবং সোমনাথ সেদিন ট্রেন থেকে কুলতলি স্টেশনে নামে। অদের হাতে ডবল ব্যারেল বন্দুক, কাঁধে চামড়ার ঢাউস ব্যাগ। স্টেশন থেকে বাইরে এসে রাস্তার একটা লোককে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের এখানে বিলটা কোথায় ভাই?'

লোকটা আঙুল বাড়িয়ে দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দেয়, 'উই উদিক পানে বাবুমশায়—'

'কতদূর এখান থেকে?'

'কত আর, দু কোশটাক হবে।'

'ট্যাক্সি ফ্যাক্সি পাওয়া যাবে?'

'না বাবুমশায়রা, হেথায় টেক্সি লেই।'

'সাইকেল রিকশা?'

'তা আছে, কিন্তন উদিকে যাবে না।'

'কেন?'

'রাস্তা তো লেই, কাদার ওপর দে হেঁটে যেতে হবে।'

অগত্যা দুই শিকারী দক্ষিণ দিক লক্ষ করে হাঁটিতে থাকে।

এদিকে ভূষণ আর লখিন্দরও বিলের দিকে যাচ্ছিল।

সারী চলে যাবার পর ক'টা দিন ঘর থেকে বেরোয় নি লখিন্দর। চুপচাপ দাওয়ায় বসে থেকেছে। ভূষণ রোজই এসে তাকে বিলে যাবার জন্য ডাকাডাকি করেছে, সে যায় নি। আজ তার ফাঁকা ঘরে ভাল লাগছিল না, তাই ভূষণ ডাকতেই বেরিয়ে পড়েছে।

বাদার ওপর দিয়ে খানিকটা হাঁটার পর ভূষণ কী বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ লখিন্দর সেই দুই শিকারীকে দেখতে পায়। তারাও মাঠ ভেঙে কোনাকুনি এগিয়ে আসছে।

লখিন্দর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, দেখাদেখি ভূষণও। সে বলে, 'কী হল রে, দেইড়ে গেলি?'

শিকারীদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে লখিন্দর বলে, 'উই দ্যাকো।'

কিছুক্ষণ ঠাহর করার পর ভূষণ বলে, 'শহরের লোক মনে হচ্চে।'

'হুঁ—'

'হাতে বন্দুক। নিঘ্ঘাত শিকারী, পাখি মারতে বিলের দিকে চলেছে। সবে পাখি পড়তে শুরু করেচে, এর ভেতর ভাগীদার জুটে গেল রে—'

লখিন্দর বলে, 'এখুন উপায়?'

ভূষণ বলে, 'এই শালোদের ভাগাতে হবে।'

'কী করে?'

'দেকি, এট্টা ফন্দি বার করতে পারি কিনা।'

একটু পরে শিকারীরাই তাদের কাছে চলে আসে। হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, এখানে বিলটা কোথায়?'

ভূষণ দ্রুত কি ভেবে নেয়। তারপর বলে, 'কেন বাবুমশায়রা?'

'শুনেছি এদিকে শীতের সময় প্রচুর পাখি আসে। শিকারের শখ আছে তো, তাই আর কি। একজন বললে বিলটা এদিকেই—'

ভুষণ বল, 'বিল ইদিকে এট্টা আচে ঠিকই, কিন্তন বাবুমশায়রা এবছর সেখেনে পাখি আসে নি।' কাল থেকে যে পাখি আসছে, সেটা বেমালুম চেপে যায়।

হিরণ্ময় বলে, 'কিন্তু—'

'কী?'

'সেই কলকাতা থেকে আসছি। দু একটা পাখি না মারতে পারলে এতদূর আসার কোনও মানে হয় না।'

ধূর্ত ভূষণ বলে, 'বাবুমশায়রা এক কাজ করুন। এখেন থিকে পুব দিকে চলে যান, সেখেনেও বিল আছে। চলে যান, ওখেনে পাখি পেয়ে যাবেন।'

সোমনাথ জিজ্ঞেস করে, 'সেটা কতদূর?'

'ক্রোশ দেড়েক হবে।'

ভূষণের কাছ থেকে রাস্তার হদিস জেনে নিয়ে সোমনাথরা পুব দিকে চলে যায়।

তারপর ভূষণ বলে, 'পাখি য্যাখন ইদিক পানে এসেচে, দু-চারটে লিচ্চয় পুবের বিলেও ছটকে গেচে। শালোরা ওখেনে গে য্যাত পারে পাখি মারুক, আমাদের বিলে ঘেঁষতে দিচ্চি না। নে, এবারে পা চালিয়ে চল—'

শিকারীদের সঙ্গে ভূষণ যে সব কথা বলছিল সেদিকে কান ছিল না লখিন্দরের। চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল সে, ভূষণের তাড়ায় আবার হাঁটতে শুরু করে।

ভূষণ চতুর হাসি হেসে বলে, 'ঐ শিকারী দুটোকে ক্যামন বুদ্দি (বুদ্ধি) করে ভাগালম দেখলি! শালোরা আমাদের ভাত মারতে এসিছিল! উটি হবে না। আমার নাম বাবা ভোষণ দাস, আমার কাচে চালাকি খাটবে নি।'

'হুঁ—হুঁ'—নিজের কৌশলে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায় ভূষণ।

ভূষণ হয়ত আশা করেছিল, তার এত বড় একটা কৃতিত্বের জন্য লখিন্দর তাকে যথেষ্ট তারিফ করবে কিন্তু সে একটি কথাও বলে না, নিস্পৃহ মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটতে থাকে। ভূষণ একটু হতাশ হয়।

ফসলকাটা মাঠের ওপর দিয়ে খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর ভূষণ ডাকে, 'হেই রে লখা—'

লখিন্দর অন্যমনস্কর মতো সাড়া দেয়, 'বল—' খানিক আগে ওরা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল আকাশ ছিল একেবারে ফাঁকা। এখন আবার দুটো-চারটে করে পাখি দেখা যাচ্ছে। উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে এসে তারা বিলের দিকে উড়ে চলেছে। লখিন্দরের নজর পাখিদের গতিবিধির দিকে।

ভূষণ আবার পুরনো দুঃখজনক প্রসঙ্গে ফিরে যায়, 'বৌটা তোরে এভাবে কষ্ট দে গেল! এট্টা ডাইন (ডাইনী)—'

ভূষণের কথায় খুব একটা প্রতিক্রিয়া হয় না লখিন্দরের। পাখিদের দিকে চোখ রেখে নিজের মনেই বিড় বিড় করে, 'সেই তুরা এলি, ক'টা দিন আগে যদিন আসতিস! সবই আমার অদ্দেষ্ট!'

ভূষণ তাকে লক্ষ করছিল। জিজ্ঞেস করে, 'কী কইচিস রে?'

'না। কিচু লয়—' আস্তে মাথা নাড়ে লখিন্দর।

ভূষণ তার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী। বিষণ্ণ মুখে বলে, 'তুর কত আর বয়েস! সামনে কত দিন পড়ে রয়েচে! বাকি জেবনটা একা একা কাটাবি কী করে রে?'

একটু আগে দুটো চারটে পাখি ছিল, এবার দিগন্তের ওপার থেকে আকাশটাকে ঢেকে দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসতে শুরু করেছে। লখিন্দরের রক্তের ভেতর দিয়ে শিহরন খেলে যায়।

পাখি দেখতে দেখতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল লখিন্দর। সে বলে, 'কী করে কাটাব? এই বাদা আচে। গাছপালা, পাখপাখালি, বিল, জঙ্গল—কত কী-ই তো রয়েচে চারপাশে। একটাই তো জেবন (জীবন) ঠিক কেটে যাবে কাকা।' বলে গলার স্বরটা তিন পর্দা চড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই হেই—' তারপরেই দৌড়তে শুরু করে।

মাথার ওপর দিয়ে হাজার হাজার পরদেশি টিয়া চলেছে বিলের দিকে। তাদের ওপর নজর রেখে স্বপ্নাবিষ্টের মতো অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে লখিন্দর ছুটতে থাকে।

---

# শেষ যাত্রা

পড়ন্ত বেলায় উত্তুরে হাওয়ার মুখে কুটোর মতো লাট খেতে খেতে খবরটা নিয়ে এল লগা, 'সব্বোনাশ হয়ে গেচে গ মাসিরা—'

কলকাতা থেকে অনেক দূরে অখ্যাত এই মফস্বল শহরটার নাম মহারাজপুর। তার এক কোণে ওঁচা মেয়েমানুষদের যে সৃষ্টিছাড়া কলোনিটা ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে সেটা চকিত হয়ে উঠল।

কলোনি আর কি, একটা চৌকো বাঁধানো উঠোন ঘিরে ফুটিফাটা টিনের চালের কোমর-বাঁকা সারি সারি সাতাশটি ঘর, সেগুলোর সামনে দিয়ে টানা বারান্দা। পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য ছাব্বিশটা মেয়েমানুষ এখানকার একটি করে ঘরের স্থায়ী বাসিন্দা। সাতাশ নম্বর ঘরটা এই কলোনির স্বত্বাধিকারিণী বা মালকিন কেষ্টভামিনীর।

মেয়েমানুষগুলোর বেশির ভাগেরই ফুল বা পাখির নামে নাম। তারা কেউ চাঁপা, কেউ জবা, কেউ মালতী, কেউ টিয়া, ময়না বা কোকিলা। বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের ভেতর। তাদের জীবনযাপনের স্পষ্ট ছাপ পড়েছে তাদের ক্ষয়াটে চেহারায়। ভাঙা গাল, চোখের তলায় চিরস্থায়ী কালির পোঁচ, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

শীতের বিকেল ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। এর মধ্যে মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। সূর্য ডুবতে আর দেরি নেই। হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মতো পশ্চিমের আকাশ আরক্ত হয়ে আছে। কিন্তু কতক্ষণ আর, দেখতে দেখতে শীতের সন্ধে নেমে আসবে ঝপ করে। চরাচর ঢেকে যাবে হিমে আর অন্ধকারে।

এই মুহূর্তে উঠোনের মাঝখানে বিকেলের নিভু নিভু রোদের আঁচ গায়ে মেখে মেয়েমানুষগুলোর কেউ খোঁপা বেঁধে রুপোর কাঁটা গুঁজে দিচ্ছিল, কেউ ঠোঁটে রং ঘষে, মুখে পাউডার আর সস্তা ক্রিম লাগিয়ে ক্ষয়ের চিহ্নগুলো ঢাকছিল। চেহারায় চটক না ফোটালে রাতের নাগরেরা তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

সন্ধে নামলেই লুচ্চা-মাতালেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে হানা দেবে। রাত যত বাড়বে, জমে উঠবে নরকের এই খাসতালুক। তারই প্রস্তুতি চলছে সারা বিকেল ধরে।

মেয়েমানুষগুলো যেখানে বসে আছে সেখান থেকে খানিকটা দূরে নিজের ঘরের সামনের দাওয়ায় বসে একা একাই সাপলুডো খেলছিল কেষ্টভামিনী। বেঢপ মাংসল চেহারা তার, একেবারে ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। গায়ের কালো রংটি যেন পালিশ করা, এমনই তার জেল্লা। চাকার মতো গোল মুখ, বড় বড় লালচে চোখ, থুতনির তলায় চর্বির তিনটি পুরু থাক। নাকে সোনার ফাঁদি নথ, কানে মাকড়ি, গলায় তেঁতুল পাতা হার। কেষ্টভামিনীর দাপটে গোটা মেয়েপাড়াটা সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে।

লগা ঘুণে-খাওয়া সদর দরজাটা পেরিয়ে উঠোনের মাঝ বরাবর চলে এসেছিল। ফের সে পাগলের মতো হাঁউমাউ করে ওঠে, 'এ কী হল গ!'

লগার গলার স্বরে এমন এক তীব্র আকুলতা ছিল যে সাতাশ জোড়া চোখ তার দিকে চকিতে ঘুরে তাকায়।

লগার বয়স উনিশ কুড়ি। রোগা ডিগডিগে পোকায়-কাটা চেহারা, গালে খাপচা খাপচা নরম দাড়ি, জট-পাকানো রুক্ষ চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেগুলোর সঙ্গে সাত জন্মে চিরুনি বা তেলের সম্পর্ক নেই। তার পরনে তালি মারা ফুলপ্যান্ট আর হাতকাটা ফতুয়া ধরনের জামা।

এখন যারা এ পাড়ার বাসিন্দা তাদের আগের জেনারেশানের একটি মেয়েমানুষ একদা লগাকে জন্ম দিয়েছিল। সেই গর্ভধারিণী কবেই মরে ফৌত হয়ে গেছে কিন্তু লগা এখানেই পড়ে আছে। তার মতো বেজন্মা বিষ্ঠার পোকাদের এই নরক ছাড়া যাবার জায়গাই বা কোথায়? চাঁপা, জবা, ময়না, টিয়া, এখানকার সবাই তার মাসি। দিনরাত্তি সে তাদের ফাইফরমাস খাটে, তার বদলে একেক দিন একেক জনের কাছে খেতে পায়। বারান্দা থেকে কেষ্টভামিনী বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই রে মড়াখেগো, অমন চেল্লাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে পষ্ট করে বল।'

লগা বলে, 'বাবামাশায় বুঝিন আর বাঁচবে নি গ মাসিরা। তেনার মুখ দে গ্যাঁজলা বারুচ্ছে, চোখ উলটে গেচে —'

মুহূর্তে গোটা মেয়েপাড়াটা একেবারে ঝিম মেরে যায়। এমন যে জবরদস্ত কেষ্টভামিনী, যার গলার আওয়াজে এ পাড়ার ত্রিসীমানায় কাক চিল ঘেঁষে না, সে পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

লগা আরও ক'পা এগিয়ে কেষ্টভামিনীর কাছাকাছি চলে আসে। ব্যাকুলভাবে বলে, 'বসে থেকোনি গ কেষ্টমাসি, শিগগিরি চল। দ্যাকো যদিন বাবামাশায়রে বাঁচাতি পার।'

এতক্ষণে গলার স্বর ফোটে কেষ্টভামিনীর। সে শুধোয়, 'বাবামাশায়ের অমন অবস্থা, তুই জানলি কী করে?'

'বা রে, বিকেল বেলা আমি ওনার ডাক্তেরখানা সাফ করতে যাই না?'

কেষ্টভামিনীর এবার খেয়াল হয়, এ পাড়ার মেয়েমানুষদের হাজার রকম হুকুম তামিল করার পর সকাল বিকেল, দু'বেলা বাবামাশায়ের ডাক্তারখানায় গিয়ে ঝেড়েমুছে সব ফিটফাট করে দেয় লগা, তার জন্য রাস্তার টিউবওয়েল থেকে কুঁজোয় ভরে জল নিয়ে আসে, কোনও কোনও দিন কেরোসিন কুকারে চাট্টি ভাতও ফুটিয়ে দেয়। আজ এবেলা গিয়ে বাবামাশায়কে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে দৌড়ে চলে এসেছে।

কেষ্টভামিনী আর বসে থাকে না, ধড়মড় করে উঠে পড়ে। নিজের ঘরে ঢুকে টিনের তোরঙ্গ থেকে কিছু টাকা বার করে আঁচলে বেঁধে বাইরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে বলে, 'চল—'

অন্য মেয়েমানুষগুলো ততক্ষণে উঠোনের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে তারা কেষ্টভামিনীকে বলে, 'আমরাও যাব কেষ্টমাসি।'

আর কিছুক্ষণের মধ্যে এ পাড়ায় খদ্দেরদের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে। সারারাত শরীর বেচে মেয়েমানুষগুলো যা পায়, এলাকার মালকিন হিসেবে তার চার ভাগের এক ভাগ কেষ্টভামিনীর প্রাপ্য। এখন যদি ওরা তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, আজকের ব্যবসাটি একেবারে মাটি। ছাব্বিশটি মেয়েমানুষের রাতভর রোজগারের সিকিভাগ তো কম কথা নয়, মনে হচ্ছে আজ আর সে আশা নেই। অনেকগুলো টাকা পুরো বরবাদ।

অন্যদিন এ সময় কেউ বেরুবার কথা মুখে আনলে মাথায় আগুন ধরে যেত কেষ্টভামিনীর। চেঁচিয়ে, গালাগাল দিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিত সে। কিন্তু বাবামাশায়ের কথা আলাদা। তার জন্য একদিন কেন, দশদিন

ব্যবসা বন্ধ রাখা যায়। ওই লোকটার কাছে এ পাড়ার বাসিন্দাদের ঋণের শেষ নেই। তার সম্বন্ধে এমন একটা খারাপ খবর শোনার পর কেউ কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে?

কেষ্টভামিনী বলে, 'আচ্ছা, চল—'

মেয়েমানুষগুলো যে জামাকাপড়ে ছিল তাই পরেই, নিজের নিজের ঘরে তালা লাগিয়ে কেষ্টভামিনী আর লগার সঙ্গে বেরুতে যাবে, এমন সময় বাধা পড়ে। উটকো দু-একটা খদ্দের এর মধ্যেই দিশি মদ গিলে টং হয়ে হানা দেয়। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির তো বিনাশ নেই। এই জন্তুগুলো দিনরাতের বাছবিচার করে না।

একটা মাঝবয়সী লোক—তার নাম মহীন, ভারি থলথলে চেহারা, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, চোখের তলায় কালি, দৃষ্টি ঢুলুঢুলু এবং আরক্ত, এ অঞ্চলে একটি ছোট যাত্রাদলের মালিক—জড়ানো গলায় বলে, 'ই কী, মিছিল করে সব চললে কুথায়?'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আজ আমাদের ক্ষেমা করেন মহীনবাবু, কাল আসবেন।'

মহীন চিড়বিড়িয়ে ওঠে, 'শরীল তেতে উঠল আজ, আর চান করব কিনা কাল! মাইরি আর কী!'

তার সঙ্গী আরেকটা ক্ষয়াটে চেহারার লোক নেশার ঘোরে সমানে টলছিল। ডাইনে বাঁয়ে এলোমেলো পা ফেলে কোনওরকমে নিজেকে খাড়া রেখেছে সে। কেষ্টভামিনীর থুতনির কাছে হাত ঘুরিয়ে বলে, 'সোনামণি, যে দোকান খুলেচ তার ঝাঁপ বন্দ করা যায় না। কত ট্যাকা চাও—অ্যাঁ—এই লাও।' বলে পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে হাওয়ায় নাচাতে থাকে।

কেষ্টভামিনীর মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল, কিন্তু শত হলেও খদ্দের লক্ষ্মী, তাদের চটানো ঠিক নয়। যতটা সম্ভব শান্ত মুখে বলে, 'দয়া করে আজ আপনারা যান।'

মহীন ওধার থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'যাব মানে! মোজ করার জন্যি এলাম, মেজাজটা চটকে দিওনি।'

এদিকে একটা নিরেট চেহারার লোক টগর নামে মেয়েটির হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দেয়, 'চল শালী, ঘরে চল–'

এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না কেষ্টভামিনী। তার ভেতর থেকে মেয়েপাড়ার জাঁদরেল স্বত্বাধিকারিণীটি বেরিয়ে আসে। আগুনখাকীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরেট লোকটার হাত থেকে টগরকে ছিনিয়ে নিতে নিতে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করতে থাকে, 'অ্যাই পুস্প, অ্যাই টিয়া, তোরা হাঁ করে দেখছিস কী! লুচ্চো জানোয়ারগুলোনরে গলাধাক্কা দে বার করে দে—'

কেষ্টভামিনীর হুকুমটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েমানুষগুলো মহীনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। সেই সঙ্গে দুই পক্ষে চলতে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত কিছু গালাগালির আদানপ্রদান।

একদিকে চারটে নেশাখোর মাতাল, আরেক দিকে সাতাশটা মেয়েমানুষ। হোক মেয়ে, এত জনের সঙ্গে চারজন পারবে কেন? টেনে হিঁচড়ে টগরেরা তাদের বাইরে বার করে দিয়ে নিজেরও বেরিয়ে পড়ে।

মেয়েমানুষদের এই পাড়াটা মহারাজপুরের শেষ মাথায়। এর বাঁ পাশ দিয়ে একটা মজা নদী বয়ে গেছে। নদীটার পাড়ে শ্মশানঘাটা, পুরনো শিবমন্দির।

পাড়াটার ডান পাশ দিয়ে একটা খোয়া-ওঠা আঁকাবাঁকা রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে। রাস্তাটার দু'ধারে ধানকল, সুরকিকল, খড়কাটা কল, লেদ মেশিনের ছোটখাটো ক'টা কারখানা। আর আছে ধানচালের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলো আড়ত। সেসব পেরিয়ে গেলে একটা হেলে-পড়া পুরনো ঘরে 'ভুবন ফার্মেসি'। ঘরটার মাথায় টুটোফুটো টিনের চাল। দেওয়াল আর মেঝে অবশ্য পাকা, কিন্তু চুনবালি আর সিমেন্ট খসে খসে দগদগে ঘায়ের মতো দেখায়। রাস্তার দিকের দরজার মাথায় মান্ধাতার আমলের যে সাইনবোর্ডটা তেরছা অবস্থায় ঝুলে আছে, বছরের পর বছর জলে ধুয়ে এবং রোদে পুড়ে তার বেশির ভাগটাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে, দু-চারটে অক্ষর ছাড়া আর কিছুই পড়া যায় না।

'ভুবন ফার্মেসি' যার নামে সেই ভুবন চক্রবর্তী হল কেষ্টভামিনীদের বাবামাশায়। এই ফার্মেসি বা ডাক্তারখানাটার পর খানিকটা জায়গা জুড়ে আগাছায় ভরা একটা উঁচুনিচু মাঠ। মাঠের ওপার থেকে শুরু হয়েছে মূল শহর। আসলে মহারাজপুরের সুখী সংসারী মানুষেরা মেয়েপাড়া আর 'ভুবন ফার্মেসি'র ছোঁয়াচ থেকে নিজেদের অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। যারা কোনও বিশেষ কারণে ধানকল, সুরকিকল বা শ্মশানঘাটার দিকে চলে আসে, দ্রুত কাজ টাজ শেষ করে ফিরে যায়। এখানকার বিষাক্ত আবহাওয়ার ভাইরাস যাতে কামড় দিতে না পারে সেজন্য তাদের সতর্কতার শেষ নেই।

মেয়েপাড়া সম্পর্কে মহারাজপুরবাসীদের মনোভাব না হয় বোঝা যায় কিন্তু 'ভুবন ফার্মেসি'র ব্যাপারে কেন তাদের এত ঘৃণা, নোংরা জীবাণুর মতো কেন তারা ওটাকে এড়াতে চায়, সে কথা পরে।

কেষ্টভামিনীরা যখন 'ভুবন ফার্মেসি'তে এসে পৌঁছুল, সন্ধে নামতে শুরু করেছে। ক'টি লোক ফার্মেসির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিল, খুব সম্ভব ভুবন চক্কোত্তি সম্পর্কেই। ওদের চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ।

কেষ্টভামিনী লোকগুলোকে মোটামুটি চেনে, এই অঞ্চলেরই ধানকল বা সুরকিকল-টলের মজুর। ওরা নিশ্চয়ই বাবামাশায়ের খবরটা পেয়ে ছুটে এসেছে।

এক পলক লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ডাক্তারখানায় ঢুকে পড়ে কেষ্টভামিনী এবং তার পেছন পেছন অন্য মেয়েরা।

ঘরটা বিরাট। মাঝখানে পর পর চারটে ওষুধ বোঝাই পুরনো আলমারি, সেগুলোর বেশির ভাগেরই পাল্লার কাচ নেই। সামনে টেবিল চেয়ার। টেবিলটার অবস্থা কহতব্য নয়, তার একটা পা আবার ভাঙা, কোনওরকমে জোড়াতোড়া দিয়ে সেটা খাড়া রাখা হয়েছে।

একটা ময়লা চিটচিটে চাদর দিয়ে টেবিলটা ঢাকা, তার ওপর ডাই-করা কাগজপত্র, স্টেথোসকোপ, দোয়াত, কালি, ব্লাড প্রেসার মাপার মেশিন

ইত্যাদি। এখানে বসেই রোগী দেখে থাকে ভুবন চক্কোত্তি। টেবিলের সামনের দিকে দুটো কাঠের বেঞ্চ। সেগুলো রোগীদের বসার জন্য।

ওষুধের আলমারির পেছন দিকে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। বাঁ দিকে একটা বড় তক্তপোশে সর্বক্ষণ একটা তেলচিটে অনন্ত শয্যা পাতা থাকে। ভুবন চক্কোত্তি ওখানে শোয়। মোট কথা, এই ঘরখানা একসঙ্গে ভুবন চক্কোত্তির রান্নাঘর, শোওয়ার ঘর এবং ডাক্তারখানা।

ঘরের মাঝখানে একটা বেশি পাওয়ারের আলো জ্বলছিল। তার আলোয় দেখা গেল বাঁ ধারের তক্তপোশটায় কাত হয়ে পড়ে আছে ভুবন চক্কোত্তি। তার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ভারি চেহারা, গোল মাংসল মুখ। মাথার একটি চুলও কালো নেই। গালে সাত আট দিনের দাড়ি। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া।

লগা যা খবর দিয়েছিল তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। কেষ্টভামিনীরা তক্তপোশের কাছে এগিয়ে এসে দেখল, ভুবনের চোখ আধবোজা, মুখ বাঁ দিকে খানিকটা বেঁকে গেছে আর গাল বেয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছে।

দু'দিন আগেও মেয়েপাড়ায় গিয়েছিল ভুবন চক্কোত্তি। তখনও তাকে যুবকদের মত তাজা, টগবগে দেখাচ্ছিল। মেয়েদের সঙ্গে কত রগড় টগড় করল। কে ভাবতে পেরেছিল দু'দিনের মধ্যে তার এমন হাল হবে।

কেষ্টভামিনী অনেকখানি ঝুঁকে আস্তে আস্তে ডাকে, 'বাবামাশায়–বাবামাশায়—'

ভুবনের দিক থেকে সাড়া নেই।

কেষ্টভামিনী আরও বার কয়েক ডাকাডাকি করল। কিন্তু একইভাবে নিশ্চল পড়ে থাকে ভুবন। এই পৃথিবীর কোনও শব্দ তার কানে পৌঁছেছে কিনা বোঝা যায় না।

কেষ্টভামিনী এবার কাঁপা গলায় তার সঙ্গিনীদের শুধোয়, ' কী করি বল দিকিন ?'

মেয়েমানুষগুলো শ্বাসরুদ্ধের মতো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মধ্যে থেকে জবা নামের মেয়েটি বলে ওঠে, 'দ্যাকো তো বাবামাশায়ের নাড়ি চলচে কিনা—'

ব্রাহ্মণ হলেও ভুবন চক্কোত্তিকে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে তাদের ভয় বা সঙ্কোচ নেই। ভুবন নিজেই সেসব অনেক আগে ভাঙিয়ে দিয়েছে। কত বার মেয়েপাড়ার বাসিন্দারা তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে তার কি হিসেব আছে! তা ছাড়া রোগবালাই হলে মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে তাকেও তো পরীক্ষা করতে হয়।

কেষ্টভামিনী ভুবনের হাতটা তুলে আঙুল দিয়ে নাড়ি টিপে ধরে। একবার মনে হয় তিরতির করে চলছে। পরক্ষণে মনে হয়— না, ওটা একেবারেই থেমে গেছে।

খুব সন্তর্পণে ভুবনের হাতটা বিছানায় নামিয়ে রেখে তার কপালে নিজের ডান হাতটা রাখে কেষ্টভামিনী। ভুবনের গা বরফের মতো ঠাণ্ডা। এবার আরও ঝুঁকে তার ফতুয়ার বোতাম খুলে বুকের ওপর কান ঠেকিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'মনে লাগচে আশা আচে। বুকটা ধুকুর ধুকুর করচে।'

টগর বলে, 'বাবামাশায়রে বাঁচানোর জন্যি কিচু তো করা দরকার।'

প্রথম দিকটায় একটু দিশেহারা হয়ে পড়লেও নিজেকে সামলে নিয়েছে কেষ্টভামিনী। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মেয়েপাড়ার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মালকিনটি, যে কোনও কারণেই সহজে বিচলিত হয় না, ভেঙে পড়ে না। বলে, 'আমি এক্ষুনি ডাক্তের ডেকে আনচি—' বলে অন্য মেয়েদের 'ভুবন ফার্মেসি'তে রেখে শুধুমাত্র জবাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে যায়।

ভুবনের ডাক্তারখানার পর আগাছাভর্তি ডাঙাটা পার হতেই একটা ফাঁকা সাইকেল-রিকশা পাওয়া গেল। জবাকে নিয়ে সেটায় উঠে কেষ্টভামিনী বলে, 'বাজার পাড়ায় চল—' মহারাজপুরের এক কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকলেও এ শহরের নাড়িনক্ষত্রের খবর তার জানা। বাজার পাড়াতেই রয়েছে এখানকার সবগুলো ডাক্তারখানা।

'ভুবন ফার্মেসি'র পর আগাছায় ভর্তি এবড়ো খেবড়ো ডাঙাটা পেরুলে ছাড়া ছাড়া কিছু বাড়িঘর। সেখান থেকে আরও খানিকটা গেলে শহরের জমজমাট চেহারাটা চোখে পড়ে। মেয়েপাড়ার বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে বহুদূরে সুখী, ভদ্র, সংসারী মানুষদের নিজস্ব এই পৃথিবী, যেখানে কেষ্টভামিনীরা দূষিত জীবাণুর মতো অবাঞ্ছিত।

চলতে চলতে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের কথা মনে পড়ছিল কেষ্টভামিনীর। সেই সময়টায় বর্ধমানের গাঁ থেকে তাকে ফুসলে বার করে নিয়ে এসেছিল তারই দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। শহরে নিয়ে তাকে রানী করে রাখবে, পটের বিবির মতো সেজে গুজে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাবে সে, ইত্যাকার নানা রঙিন স্বপ্নে তাকে একেবারে জাদু করে ফেলেছিল সেই ফন্দিবাজ লুচ্চাটা। তার আগে হাজার হাজার যুবতী ঘোরের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যা করে বসে তা-ই করেছিল কেষ্টভামিনী। এমন এক ফাঁদে সে পা দিয়েছিল, যেখান থেকে বেরিয়ে আর কোনওদিন বাড়ি ফেরা যায় না।

দিন কয়েক ফুর্তি টুর্তি লোটার পর মহারাজপুরের মেয়েপাড়ায় তাকে পৌঁছে দিয়ে সেই আত্মীয়টি উধাও হয়ে যায়। প্রথম প্রথম যা হয়, খুবই কান্নাকাটি করেছিল কেষ্টভামিনী, তিনদিন এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খায়নি, কতবার আত্মহত্যার চিন্তাটা তার মাথায় এসেছে তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু জীবন এক বিষম ব্যাপার। ধীরে ধীরে কবে যে মেয়েপাড়ার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল, এতকাল পর আর মনে পড়ে না।

সেই পঁচিশ বা তিরিশ বছর আগে এখনকার মতো বেঢপ আর থলথলে ছিল না কেষ্টভামিনী। কালো হলেও চেহারাটা ছিল ছুরির ফলার মতো, এমন একটা চটক ছিল যে তার দিক থেকে চোখ ফেরানো যেত না। তার মেয়েপাড়ায় আসার খবরটা চারপাশে আগুনের হলকার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজপুরের যত জঘন্য লুচ্চার পাল এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। তার ফল হল এই, বছরখানেকের ভেতর চাকা চাকা ঘায়ে ভরে গেল সারা শরীর।

সেই সময় মেয়েপাড়ার মালকিন ছিল প্রমদা। ভয়ঙ্কর জাঁদরেল মেয়েমানুষ। চিলের মতো ধারাল গলায় চেঁচিয়ে সে বলেছে, 'পারার ঘা লিয়ে আমার এখেনে থাকা চলবে নি। খদ্দেররা জানতে পারলে এধার মাড়াবে নি। ব্যবসাটি পুরো লষ্ট। তাড়াতাড়ি যদিন সারাতে পারিস, থাকতে পাবি, লইলে দূর করে দুবো।'

কেষ্টভামিনীর তো বাড়ি ফেরার উপায় নেই। এই নরকেই তাকে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। কাজেই রোগ না সারালেই নয়। কিন্তু কোথায় ডাক্তার কোথায় বদ্যি, কিছুই জানত না সে। যে মেয়েরা তখন ছিল তাদের হাতেপায়ে ধরে বলেছে, যদি একজন ডাক্তারের কাছে তাকে নিয়ে যায়। কিন্তু তার ওপর সবার ছিল ভীষণ হিংসে, পারলে ওরা তাকে ছিঁড়ে খেত। কেননা সে আসার পর খদ্দেররা কেউ আর ওদের দিকে তাকাত না। মুখ ঝামটা দিয়ে ওরা সাফ বলে দিয়েছিল, 'আমাদের কাচে মরতে এসিচিস কেন লা মাগী! যে লাগরেরা তোরে পারার ঘা দে পালিয়েচে তারা কুথায়? যা যা, তাদের কাচে যা—'

কেষ্টভামিনী বুঝতে পেরেছিল, ওদের কারও কাছেই সাহায্যের আশা-ভরসা নেই। মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত সে একা একাই একদিন সকালে বেরিয়ে পড়েছিল। ধানকল, সুরকিকল, তেলকল, বড় বড় গুদাম আর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা পেছনে ফেলে আসল শহরে চলে গিয়েছিল সে।

এখানকার প্রায় কিছুই তখন চিনত না কেষ্টভামিনী। একে ওকে জিজ্ঞেস করে করে শেষ পর্যন্ত বাজার পাড়ায় এসে হাজির হয়।

সেই সময় মহারাজপুরের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তার ছিল ত্রৈলোক্য হালদার। দুর্দান্ত পসার তার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চৌকো মুখ, শুঁয়োপোকার মতো ভুরু দুটো সবসময় কুঁচকেই আছে। অত্যন্ত খেঁকুরে, রগচটা ধরনের লোক। তার ডাক্তারখানায় গিয়ে দাঁড়াতেই রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী চাই?'

কেষ্টভামিনী হালদারের মুখচোখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলেছে, 'ডাক্তারবাবু, আমার বড় ব্যারাম—'

ত্রৈলোক্য তাকিয়েই ছিল। মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের চেহারায় মার্কামারা একটা ছাপ থাকে। কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্রই বুঝে নিয়েছে, সে কোত্থেকে আসছে। তীব্র ঘৃণায় তার ভুরু আরও কুঁচকে গিয়েছিল। গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে ত্রৈলোক্য চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'সকালবেলায় নরক দর্শন! যা যা, বেরো এখান থেকে

তবু দাঁড়িয়ে ছিল কেষ্টভামিনী। হাতজোড় করে কাতর গলায় বলেছে, 'ডাক্তারবাবু, তাড়ায়ে দেবেন না। রোগ না সারলে আমি মরে যাব।'

'যত সব নর্দমার পোকা! তোর বেঁচে থেকে দুনিয়ার কোন উপকারটা হবে শুনি?' ডাক্তারখানার কমপাউণ্ডারকে ডেকে ত্রৈলোক্য বলেছিল, 'মাগীটাকে লাথি মেরে বার করে ওই জায়গায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও—'

লাথি আর মারতে হয়নি, নিজেই বেরিয়ে এসেছিল কেষ্টভামিনী।

মহারাজপুরে তখন আরও চার পাঁচ জন পাস-করা ডাক্তার ছিল। হালদারের অমন চমৎকার অভ্যর্থনার পরও তাদের সবার কাছে গেছে কেষ্টভামিনী কিন্তু সকলেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ্যার চিকিৎসা তারা করবে না।

ফলে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিল কেষ্টভামিনী। সেই সঙ্গে আতঙ্কিতও। যে রোগটি তার হয়েছে সেটা কতখানি মারাত্মক তা সে জানে। তবে কি বিনা চিকিৎসায়, পচে গলে, যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে তাকে মরতে হবে? মাসি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ব্যারাম না সারালে পাড়ায় থাকতে দেবে না। যা ছোঁয়াচে রোগ, অন্যদের ধরলে আর দেখতে হবে না, মেয়েপাড়া উজাড় হয়ে যাবে। তাকে থাকতে দিয়ে মাসি ওইরকম কোনও ঝুঁকি নিতে পারে না। কিন্তু মেয়েপাড়া ছাড়তে হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মহারাজপুরের খোয়া-ওঠা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কেষ্টভামিনীর নজরে পড়ল, প্রকাণ্ড এক পুরনো দোতলা বাড়ির সামনের দিকের একটা ঘরের দরজার মাথায় টিনের সাইনবোর্ডে বাংলায় লেখা আছে 'ভুবন ফার্মেসি'। তার নিচে 'ডাক্তার ভুবন চক্রবর্তী'। বাংলাটা মোটামুটিভাবে পড়তে আর লিখতে পারত সে, তাই জানতে পেরেছিল ওটা ডাক্তারখানা।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কেষ্টভামিনী। আগের ডাক্তারখানাগুলোতে তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না, ঠিক করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলে সে। বড় জোর অন্য জায়গার মতো এখান থেকেও তাকে বার করে দেবে, তার বেশি তো কিছু নয়।

কেষ্টভামিনী যখন এসব ভাবছে, সেইসময় ভেতর থেকে একটা ভারি গলা ভেসে এসেছিল, 'কে, কে ওখানে?'

ভারি হলেও কণ্ঠস্বরটি ভয়-ধরানো নয়। পায়ে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে কেষ্টভামিনী বলেছে, 'আমি— আমি—'

ভেতরে কিছু ওষুধের আলমারি, টেবিল চেয়ার। এক কোণে আধময়লা একটা পর্দা টাঙিয়ে তার ওপাশে রোগী দেখার ব্যবস্থা।

টেবিলের ওধারে যে ডাক্তারবাবুটি বসে ছিল তার বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। নাকের তলায় ঝুপো গোঁফ। পরনে গলাবন্ধ কোট আর ধুতি। ডাক্তারের ডান পাশে একটা লোক, খুব সম্ভব অর কম্পাউণ্ডার। সেই সকালবেলায় রোগী টোগী ছিল না, ডাক্তারখানা একেবারে ফাঁকা।

ভুবন চক্রবর্তী পুরোপুরি পাস-করা ডাক্তার নয়। বাঁকুড়া না কোথায় যেন মেডিক্যাল স্কুলে বছর দুই যাতায়াত করেছিল। সেই পঁচিশ তিরিশ বছর আগে এই বিদ্যেতেই কাজ চলে যেত। পাস-করাদের মতো পসার না হলেও রোগীটোগী কম হতো না তার ডাক্তারখানায়।

ভুবন বলেছিল, 'ভেতরে এস।'

ডাক্তারখানায় ঢুকে টেবিলের এপারেই মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে কেষ্টভামিনী। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলেছে, 'আমারে বাঁচান বাবামাশায়—' কেন যে তার মুখ দিয়ে বাবামাশায় শব্দটা বেরিয়ে এসেছিল, নিজেই জানে না। শুধু মনে হয়েছিল এই মানুষটির করুণা হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

ভুবন বলেছিল, 'আগে বোসো। তারপর বল কী হয়েছে তোমার।'

মেয়েপাড়ার বাইরে কেউ তাকে বসতে বলবে, কেষ্টভামিনীর কাছে এটা একেবারে আশাতীত। সেই সকাল থেকে যে লাঞ্ছনা আর ঘৃণা জুটেছে, তারপর ভুবন চক্রবর্তীর এই সদয় ব্যবহারে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটা চেয়ারে খুব জড়সড় হয়ে বসে মুখ নামিয়ে রেখে সে বলেছে, 'আমি কুথায়, কুন লরকে থাকি, লিচ্চয় বুঝতে পারচেন।'

বিব্রতভাবে ভুবন বলেছে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ব্যারামের কথাটা বল—'

কোন বিষম রোগে তাকে ধরেছে, এরপর তার বিবরণ দিয়ে ব্যাকুলভাবে কেষ্টভামিনী বলেছে, 'আপনি ছাড়া আমারে বাঁচাবার আর কেউ লেই বাবামাশায়।'

একটু চুপ করে থেকেছে ভুবন। বাজারের একটি মেয়ের চিকিৎসা করবে কি করবে না, সেটাই যেন ভেবে উঠতে পারছিল না।

উৎকণ্ঠায় শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল কেষ্টভামিনীর। সে বলেছে, 'বাবামাশায়, আপনার দয়া কি পাব না? রাস্তায় পড়ে পড়ে মরে যাব?'

কেষ্টভামিনীর শেষ কথাগুলো ভুবনকে যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল সে, বলেছিল, 'চিন্তা করিস না, আমি তোকে সারিয়ে তুলব।' তুমি থেকে এক লহমায় তুইতে নেমে গিয়েছিল সে।

সেদিন থেকেই চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। কেষ্টভামিনীর গা ভর্তি ঘা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়েছিল ভুবন। ওষুধে কতটা কাজ হচ্ছে তা দেখার জন্য রোজ সকালে একবার করে ডাক্তারখানায় আসতেও বলেছিল। কৃতজ্ঞতায় দু'চোখে জল এসে গেছে কেষ্টভামিনীর। ধিক্কার, ঘৃণা আর লাঞ্ছনা ছাড়া তারা তো এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর কাছ থেকে কিছুই পায় না। ভুবনের সহানুভূতি তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে।

মাসখানেকের ভেতর রোগ সেরে গিয়েছিল কেষ্টভামিনীর। কিন্তু বাবামাশায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা থেকেই যায়। সারা রাত জন্তুর দল তার শরীরটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে কামড়ে আঁচড়ে শেষ করে দেবার পর সকালে চান করে সে চলে আসত 'ভুবন ফার্মেসি'তে। ভেতরে ঢুকত না, বাইরে দাঁড়িয়ে দরজার চৌকাঠের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে চলে যেত।

এইভাবেই চলছিল।

খারাপ রোগ বেছে বেছে শুধু কেষ্টভামিনীকেই ধরবে, এমন কোনও কথা নেই। যে লুচ্চার পাল রাতে হানা দেয়, শুধু কেষ্টভামিনীরই না, অন্য মেয়েদের শরীরেও তারা বিষাক্ত বীজাণু ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ফলে অনিবার্য নিয়মে তাদের গায়েও একদিন না একদিন দগদগে পারার ঘা ফুটে বেরুতে থাকে।

রোগাক্রান্ত দিশেহারা মেয়েরা গিয়ে ধরে কেষ্টভামিনীকে, 'যে ডাক্তার তোরে সারায়ে দেচেন আমাদেরকে তেনার কাচে নে চল। যন্ত্রনায় মরে যাচ্চি রে—'

এরাই একদিন ডাক্তারদের হদিস দিয়ে তাকে এতটুকু সাহায্য যে করেনি সেটা আর মনে করে রাখেনি কেষ্টভামিনী। সে ওদের সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'তে নিয়ে গিয়েছিল। ভুবন তাদেরও ফিরিয়ে দেয়নি। বরং বলেছে, 'কেষ্টভামিনী যখন নিয়ে এসেছে তখন ভেবো না। ধরে নাও রোগ সেরেই গেছে।'

এইভাবে মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের সঙ্গে ভাল রকমের সম্পর্ক হয়ে গেল ভুবন ডাক্তারের। কিন্তু অন্য দিকে প্রচণ্ড ধুন্ধুমারও বেধে যায়। যে বাড়িটায় ভুবনের ডাক্তারখানা সেটা তার পৈতৃক আমলের। তার বাবা-মা বহুদিন আগেই মারা গেছে, স্ত্রীও বেঁচে নেই, তার ছেলেমেয়ে হয়নি। সে একেবারে ঝাড়া হাত-পা মানুষ। কিন্তু বাড়িতে ছিল সাত সাতটা ভাই। তারা বাজারের মেয়েদের নানা কুৎসিত রোগ নিয়ে রোজ আসাটা আদৌ পছন্দ করছিল না। এই নিয়ে অশান্তি চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। ভাইরা বলছিল, এই বিষ্ঠার পোকাদের বাড়িতে আনা চলবে না। ভুবনের জন্য এত বড় চক্রবর্তী-বংশ একেবারে অপবিত্র হয়ে গেল। শুধু তা-ই নয়, এরা নিয়মিত আসার কারণে তলায় তলায় আরও কত সর্বনাশ হয়ে গেছে কে জানে। কেননা বাড়িতে যুবক ছেলেছোকরা তো কম নেই। তারা এইসব নোংরা ওঁচা মেয়েমানুষগুলোর ফাঁদে যে লুকিয়ে লুকিয়ে পা দিয়ে বসেনি তারই বা গ্যারাণ্টি কোথায়? চক্রবর্তীরা নিষ্ঠাবান সৎ ব্রাহ্মণ, তাদের শুদ্ধতা আর রইল না। বাড়িটা বাজারের মেয়েদের একটা কলোনি হয়ে উঠল। ওদের আর এখানে আসা চলবে না।

ভাইদের সঙ্গে গোলমালের ব্যাপারটা তখনই জানতে পারেনি কেষ্টভামিনী, জেনেছিল অনেক পরে।

যাই হোক, মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের মুখের ওপর 'না' বলে দেওয়া সম্ভব ছিল না ভুবনের পক্ষে। প্রথমত, এই দুঃখী অসহায় মেয়েগুলোর ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল তার। তার চেয়েও জোরালো কারণটা হল পয়সা। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ থেকে

মহারাজপুরে এসে সে যখন ডিসপেনসারি খুলে বসল তখন এখানে পাস-করা ডাক্তার ছিল হাতে-গোনা তিন চারজন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সারা দেশ জুড়ে যে জনবিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করেছির তার হাওয়া এসে লেগেছিল এই শহরেও। অ ছাড়া সে আমলের পূর্ব পাকিস্তান থেকে হু হু করে শরণার্থীর ঢলও নেমেছিল এখানে। শহর বড় হতে লাগল, মানুষ বাড়তে লাগল। অনিবার্য নিয়মে ডাক্তারের সংখ্যাও বেড়ে চলল। নতুন যেসব ডাক্তার এল তাদের নামের পাশে লম্বা লম্বা ডিগ্রি। তাদের ছেড়ে রোগ সারাতে কেউ ভুবন ডাক্তারের কাছে আসবে কেন? তার হাতে রয়ে গেল কিছু গরিব গুর্বো—ধানকল সুরকিকলের মজুর আর মেয়েপাড়ার ওঁচা ক'টি মেয়েমানুষ। এদের, বিশেষ করে মেয়েমানুষগুলোর তার ওপর অগাধ আস্থা। তাদের আনুগত্যের ভেতর কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। বাঁচুক মরুক, ভুবনের হাতের ওষুধটি ছাড়া তাদের চলবে না। ভুবনেরও ওদের ছাড়া গতি নেই।

ভুবন ভাইদের বুঝিয়েছে, 'মেয়েগুলো ভাল রে, নেহাৎ কপালের ফেরে পাঁকে নামতে হয়েছে।'

ভাইরা বলেছে, 'বেশ্যা আবার ভাল! নচ্ছার পাপীর দল।'

'পাপী হয়ে কেউ জন্মায় না। ওদের এই অবস্থার জন্যে আমাদের সোশাল সিস্টেমটাই দায়ী।'

সমাজতত্ত্বের এসব গূঢ় ব্যাখ্যা শোনার মতো ধৈর্য ছিল না ভাইদের। তাদের সাফ কথা, বাজারের মেয়েদের বাড়িতে আনা চলবে না। ডিসপেনসারিটা যদিও রাস্তার দিকে, তবু সেটা বাড়িরই একটা অংশ তো।

এই নিয়ে একদিন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। ভুবন চক্রবর্তী ঠিক করে ফেলল, ভাইদের সংস্রবে আর থাকবে না। বাড়ি থেকে ডিসপেনসারি তুলে নিয়ে সে চলে এল গুদাম ঘরগুলোর কাছাকাছি একটা টিনের চালায়। সেই থেকে পঁচিশ তিরিশটা বছর এখানেই কেটে গেল তার। মহারাজপুরের যে অংশে সুখী, ভদ্র, সামাজিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ মানুষেরা থাকে তার সঙ্গে ভুবনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

তিরিশ বছর কম সময় নয়। এর মধ্যে মহারাজপুর যেমন বদলে গেছে তেমনি পরিবর্তন হয়েছে মেয়েপাড়াতেও। সেদিনের ছিপছিপে পাতলা

গড়নের যুবতী কেষ্টভামিনী এখন থলথলে ভারি চেহারার মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ এবং ওখানকার মালকিন। সে আমলের অন্য মেয়েরা বেশির ভাগই মরে হেজে সাফ। কেউ কেউ পাড়া ছেড়ে কোথায় চলে গেছে তার হদিস কেষ্টভামিনীরা রাখে না। পৃথিবীর কোথাও ফাঁকা জায়গা তো পড়ে থাকে না। অনিবার্য নিয়মেই নতুন জেনারেশানের মেয়েরা এসে গেছে।

এতগুলো বছর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে মেয়েগুলোর পাশেপাশেই আছে ভুবন চক্রবর্তী। রোগ বালাইয়ের চিকিৎসা তো করেই, পুলিশ বা লুচ্চারা হামলা করলে সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায়। যেন দশ হাত দিয়ে মেয়েগুলোকে আগলে রেখেছে ভুবন। দুই প্রজন্ম ধরে, কেষ্টভামিনী থেকে এখনকার টগর বা টিয়া-ময়নাদের সে বাবামাশায়।

আগাছায় ভরা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে কখন যে কেষ্টভামিনীদের রিকশাটা মহারাজপুরের বাজারপাড়ায় চলে এসেছিল, খেয়াল নেই। এটাই শহরের সবচেয়ে জমকালো অংশ। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই বাজারপাড়ার সঙ্গে এখনকার বাজারপাড়ার মিল সামান্যই। আগে বেশির ভাগই ছিল টিনের চালের ঘর, ফাঁকে ফাঁকে ক্বচিৎ দু-চারটে বেঢপ চেহারার একতলা কি দোতলা। এখন যেদিকে যতদূর চোখ যায় লাইন দিয়ে নতুন নতুন তেতলা আর চারতলা বাড়ি। সেগুলোর নিচের তলায় বিরাট বিরাট সব দোকান। কলকাতার ধাঁচে দুর্দান্ত সব শো-উইণ্ডো— কোনওটা টিভির, কোনওটা ফ্রিজের, কোনওটা রেডিমেড পোশাকের, কোনওটা বা নাম-করা টেক্সটাইল মিলের। ওষুধের দোকান, রেস্তোরাঁ, ব্যাঙ্ক, ডাক্তারদের চেম্বার, সিনেমা হল —সব এখানেই। সারাদিন তো বটেই, অনেকটা রাত পর্যন্ত জায়গাটা গমগম করতে থাকে।

এখানকার সমস্ত কিছুই কেষ্টভামিনীর মুখস্থ। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেই যে প্রথম এখানে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ডাক্তারের খোঁজে ছুটে এসেছিল, তারপর কতবার এসেছে তার হিসেব নেই।

'রিলায়েন্স ফার্মেসি' নামে একটা বড় ডাক্তারখানার সামনে এসে রিকশা থামায় কেষ্টভামিনী। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ে।

ডাক্তারখানাটার সামনের দিকে সারি সারি কাচের আলমারি দিয়ে সাজানো ওষুধের দোকান, পেছন দিকে ডাক্তার হিরণ্ময় সেনের চেম্বার। হিরণ্ময়ের বয়স বেশি না, চল্লিশের অনেক নিচে। কিন্তু এর মধ্যেই যথেষ্ট নাম করে ফেলেছে। উঠতি ডাক্তারদের মধ্যে তার পসার সবচেয়ে বেশি। সর্বক্ষণ তার চেম্বারে লাইন লেগে থাকে।

ওষুধের আলমারিগুলোর ডান পাশ দিয়ে একটা সরু প্যাসেজ চলে গেছে ভেতর দিকে। তার শেষ মাথায় রোগীদের জন্য ওয়টিং রুম, অরপর দরজায় পরদা-লাগানো ডাক্তারদের কামরা।

ওয়েটিং রুমে ভিড় ছিল। সেখানে এসে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর কেষ্টভামিনীর ডাক পড়ল।

বড় টেবিলের ওধার থেকে লম্বা ঝকঝকে চেহারার হিরণ্ময় ডাক্তার বলে, 'বলুন কী হয়েছে?'

দিনকাল এখন অনেক বদলে গেছে। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্র এই মহারাজপুরের ডাক্তাররা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখনকার ডাক্তাররা একেবারে অন্যরকম। তাদের শুচিবাই নেই। দুটো ব্যাপারই তারা বোঝে— রোগ এবং টাকা। রোগটা কার তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। টাকাটা কার কাছ থেকে এল—চোর, লুচ্চা না বেশ্যা —সে সম্বন্ধে তাদের দুর্ভাবনা নেই। ওদের কাছে রোগ সারিয়ে টাকা পাওয়াটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আর সব কিছুই অর্থহীন।

হাতজোড় করে কেষ্টভামিনী বলে, 'ডাক্তারবাবু, আপনারে আমার সনগে যেতি হবে। বাবামাশায় মরতি বসেচে, আপনি তেনারে বাঁচান।'

হিরণ্ময় হকচকিয়ে যায়, 'বাবামাশায় কে?'

ভুবন ডাক্তারের নাম বলে কেষ্টভামিনী, কিন্তু নামটা আদৌ হিরণ্ময় আগে শুনেছে কিনা বোঝা গেল না। আসলে ভুবন সেই যে মহারাজপুরের আদি এলাকা ছেড়ে ধানকল সুরকিকলের কাছে চলে যায়, অরপর এদিকে আর বিশেষ আসেনি। তার সঙ্গে এ অঞ্চলের যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মহারাজপুরের ভদ্রপাড়ার মানুষজন অকে মনে করে রাখেনি।

হিরণ্ময় ভুবন সম্পর্কে আর কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ করে না। শুধু জিজ্ঞেস করে, 'তাঁকে দেখতে কোথায় যেতে হবে?'

কেষ্টভামিনী বলে, 'ওই যে ধানকল খড়কলগুলোন যেখেনে আচে সেখেনে—'

'এক্ষুনি বেরুতে পারব না। অনেক রোগী অপেক্ষা করছে, তাদের দেখতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে—'

'আমরা বসচি ডাক্তারবাবু। আপনি কাজ সেরে লিন।'

'আমার ভিজিট কত জানা আছে?'

'না।'

'রোগীর বাড়ি গেলে চৌষট্টি টাকা নিই আর যাতায়াতের রিকশা ভাড়া—'

এতগুলো টাকা! বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে কেষ্টভামিনীর। পরক্ষণে মনে পড়ে, ভুবন চক্রবর্তী একদিন তার নতুন জীবন দিয়েছিল। শুধু তা-ই না, মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের জন্য নিজেদের বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল। তার জন্য সামান্য ক'টা টাকা সে খরচ করতে পারবে না? তা ছাড়া কেষ্টভামিনী জানে, সুস্থ হবার পর ভুবন চক্রবর্তী হিসেব করে তার প্রতিটি পয়সা ফেরত দিয়ে দেবে। কারও কাছেই সে ঋণী হয়ে থাকতে চায় না।

কেষ্টভামিনী বলে, 'দেব ডাক্তারবাবু, আপনি যা কইলেন তা-ই দেব।'

এরপর ভুবন ডাক্তারের রোগের লক্ষণগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়ে কেষ্টভামিনীকে ওয়েটিং রুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলে হিরণ্ময়।

কিন্তু এক ঘণ্টা নয়, প্রায় ঘণ্টাদেড়েক বাদে কেষ্টভামিনীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে হিরণ্ময়। রাস্তায় এসে দুটো সাইকেল রিকশা নেওয়া হয়। সামনের রিকশায় ওঠে কেষ্টভামিনী আর জবা, পেছনেরটায় হিরণ্ময়, তার সঙ্গে ওষুধপত্রে বোঝাই ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগ। আগে আগে থেকে কেষ্টভামিনীরা হিরণ্ময়ের রিকশাটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

'ভুবন ফার্মেসি'তে যখন ওরা পৌঁছল, বেশ রাত হয়ে গেছে। এ পাড়ায় এমনিতে লোক চলাচল যেটুকু হয় তার বেশির ভাগটাই দিনের বেলায়। সন্ধের পর, বিশেষ করে শীতকালে জায়গাটা নির্জন হয়ে যায়। এখন তো একেবারেই নিঝুম।

লগার মুখে সেই পড়ন্ত বেলায় ভুবনের খবরটা পাওয়ার পর মেয়েপাড়া ফাঁকা করে যারা কেষ্টভামিনীর সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল সেই টগর টিয়া ময়নারা এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকজন ভুবনের কাছাকাছি ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে আছে। তাদের মধ্যে লগাকেও দেখা যাচ্ছে। তবে ধানকল, সুরকিকল কি লেদ মেশিনের মজুররা আর নেই, তারা সন্ধের পরপরই চলে গেছে।

মেয়েমানুষগুলোর চোখেমুখে ঘোর উৎকণ্ঠা। কেষ্টভামিনী কখন ডাক্তার নিয়ে ফেরে সেজন্য তারা পথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সাইকেল রিকশা থেকে নেমে কেষ্টভামিনী তাড়া লাগানোর সুরে লগাকে বলে, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুর বাক্সটা লাবিয়ে নে আয়।'

হিরণ্ময় নেমে পড়েছিল। কেষ্টভামিনী তাকে সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'র ভেতর চলে আসে। পেছন পেছন মেডিক্যাল ব্যাগ নিয়ে আসে লগা এবং অন্য মেয়েরা।

যে মেয়েমানুষগুলো ভুবনকে ঘিরে বসে ছিল, হিরণ্ময়দের দেখে উঠে দাঁড়ায়।

হিরণ্ময় বলে, 'রোগীর ঘরে এত ভিড় কেন? আপনারা বাইরে যান।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আমিও যাব?'

'না। আপনি থাকুন।'

মেয়েরা বাইরে গিয়ে দরজার কাছে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ভুবনকে পরীক্ষা করতে করতে হিরণ্ময় বুঝে যায় মারাত্মক ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। মুখের বাঁ দিকে আর শরীরের নিচের অংশটায় পক্ষাঘাতের সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট।

কেষ্টভামিনী শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে, 'বাবামাশায়ের কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?'

'স্ট্রোক।' বলেই হিরণ্ময়ের খেয়াল হয়, ইংরেজি শব্দটা বোধহয় বুঝতে পারবে না কেষ্টভামিনী। সোজা বাংলায় বুঝিয়ে দেয়, 'বুকের অসুখ।'

'বাঁচবে তো?'

'দু'দিন না কাটলে বলতে পারব না।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'বাবামাশায়রে বাঁচায়ে তোলেন ডাক্তারবাবু।'

হিরণ্ময় বলে, 'বাঁচা-মরা মানুষের হাতে নেই, তবে ডাক্তার হিসেবে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু—'

'কী?'

'অনেক রকম পরীক্ষা করতে হবে রোগীর। তার ওপর ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশান, এ সব তো আছেই। প্রচুর খরচ—'

খরচের কথায় ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে যায় কেষ্টভামিনী। ঢোক গিলে বলে, 'কিরকম লাগবে যদিন বলেন—'

হিরণ্ময় জানায়, রোগীর যা হাল তাতে আজই দু-একটা পরীক্ষা করা দরকার। সেগুলো না হলে ভাল করে চিকিৎসা শুরু করা যাবে না। প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য আপাতত শ'তিনেক টাকা চাই।

কেষ্টভামিনীর ঘরে জমানো টাকা নিশ্চয়ই আছে। তার থেকে শ' খানেকের মতো নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল তাতেই হয়ে যাবে। কিন্তু আরও তিনশ' বার করাটা খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। ওই তিন শ'তেও যে হবে না, সেটাই হিরণ্ময় ডাক্তার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে।

কেষ্টভামিনীর সঞ্চয় তো অফুরন্ত নয় যে ভুবনের চিকিৎসার যাবতীয় খরচ যুগিয়ে যেতে পারবে। তা ছাড়া তারও ভবিষ্যৎ বলে একটা কিছু আছে। হাতের সম্বল ভেঙে ফেললে বিপদে পড়তে হবে।

কেষ্টভামিনী বলে, 'খরচার ব্যাপারটা আমাদের এট্টু ভাবতে দ্যান ডাক্তারবাবু।'

হিরণ্ময় বলে, 'তা ভাবুন। তবে এটা জেনে রাখুন, রোগীর অবস্থা খুব খারাপ। যা করার আজই করে ফেলতে হবে কিন্তু।'

একটু চিন্তা করে কেষ্টভামিনী বলে, 'আজই আপনারে জানায়ে দেব।'

'আমি ন'টা পর্যন্ত চেম্বারে থাকব। এলে তার ভেতর আসবেন।'

'আচ্ছা।'

এবার ভুবনকে একটা ইঞ্জেকশান দেয় হিরণ্ময়। তারপর কয়েকটা ট্যাবলেট কেষ্টভামিনীকে দিয়ে বলে, 'এখন জ্ঞান নেই ভুবনবাবুর, জ্ঞান ফিরলে তিন ঘণ্টা পর পর একটা করে ট্যাবলেট খাইয়ে দেবেন। আর রাত্তিরে সবসময় ওঁর কাছে লোক রাখবেন। আরও খারাপ কিছু বুঝলে আমাকে খবর দেবেন। চেম্বারের ওপরেই দোতলায় আমি থাকি।'

কেষ্টভামিনী ঘাড় কাত করে বলে, 'দেব।'

হিরণ্ময় বাইরের রাস্তায় রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। নিজের ফী, ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশানের দাম এবং রিকশাভাড়া নিয়ে একসময় চলে যায়।

যে মেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ঘরে ডেকে এনে কেষ্টভামিনী শুধোয়, 'সবই তো শুনলি। অখুন কী করা?'

মেয়েরা চুপ করে থাকে।

কেষ্টভামিনী আবার বলে, 'আমার একলার পক্ষে এত বড় রোগের চিকিচ্ছা চালানো অসোম্ভব।'

কেউ উত্তর দেবার আগে জবা নামের মেয়েটি বলে ওঠে, 'ট্যাকার জন্যি বাবামাশায় মরে যাবে? তুমি আমাদের কি করতে বল?'

তক্ষুনি কিছু বলে না কেষ্টভামিনী। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে শুরু করে, 'তোদের হাল তো জানি। তবু না বলে পারচি না। সব্বাই মিলে কিচু কিচু দিলে একজনার ওপর চাপটা পড়ে না। উদিকে বাবামাশায়ের পেরানটা বেঁচে যায়। অখুন ভেবেচিন্তে দ্যাক কী করবি?'

অনেকক্ষণ মেয়েমানুষগুলো নিজেদের ভেতর চাপা গলায় আলোচনা করে নেয়। কেউ কি আর প্রাণ ধরে জমানো টাকায় হাত দিতে চায়! কিন্তু ভুবন চক্রবর্তীর কথা আলাদা। তার জন্য ওরা সব পারে।

ভিড়ের ভেতর থেকে টগর বলে ওঠে, 'আমি দেব কিচু ট্যাকা। আমারে বাবামাশায় যে ব্যারাম থিকে বাঁচায়েছিল তা কি কুনোদিন ভুলব! আমি বেঁচে থাকতি বিনি চিকিচ্ছায় বাবামাশায়রে মরতি দেবনি।' তার গলা আবেগে কাঁপতে থাকে।

টগরের আবেগ বিদ্যুৎগতিতে অন্য মেয়েদের মধ্যেও চারিয়ে যায়। তারা একসঙ্গে বলতে থাকে, 'ট্যাকার জন্যি ভেবো না মাসি। আমরাও দেব।'

কে কত দিতে পারবে, জেনে নেয় কেষ্টভামিনী। দেখা গেল সাতশ টাকার মতো পাওয়া যাবে। ঠিক হল, আপাতত এই দিয়েই ভুবন চক্রবর্তীর পরীক্ষা-টরীক্ষাগুলো শুরু হোক, পরে আরও টাকার দরকার হলে দেখা যাবে।

কেষ্টভামিনী বলে, 'তোরা তো কেউ ট্যাকা সন্‌গে করে আনিস নি।'

মেয়েরা বলে, 'না। লগা খবর দিতেই তো তোমার সন্‌গে দৌড়ে চলে এলাম।'

'তা হলে যা, নে আয়।'

টিয়া ময়নারা মেয়েপাড়ায় গিয়ে টাকা নিয়ে আসে।

কেষ্টভামিনী এবার আর নিজে হিরণ্ময় ডাক্তারের চেম্বারে গেল না, তিনশ' টাকা সঙ্গে নিয়ে জবা আর টিয়াকে পাঠিয়ে দিল। তারপর অন্য মেয়েদের উদ্দেশে বলে, 'ঘরগুলোন সব ফাঁকা পড়ে আচে। সবাই এখেনে থেকে কী হবে? আমি তো রইচিই, দু-চারজন আমার সন্‌গে থাক। বাকিরা পাড়ায় ফিরে যা। লইলে চোর-ছ্যাঁচোড়ে ঘরের তালা ভেঙে চেঁচেপুচে সব নে যাবে। ব্যবসাটি তো আজ একরকম মাটিই হল। যারা যাবি, দ্যাক যদিন দুটো পয়সা কামাই হয়—'

কিন্তু ভুবনকে এই অবস্থায় ফেলে একটি মেয়েও তাদের পাড়ায় ফিরে যেতে রাজি হল না। তারা এখানেই থেকে যাবে। রোগবালাই হলে কত রাত তো রোজগার বন্ধ থাকে। ধরা যাক, আজ তেমন কিছু একটা হয়েছে তাদের।

কেষ্টভামিনী বলে, 'তা না হয় থাকলি, কিন্তুন ঘরদোর পাহারা দেবার জন্যি কারুর না কারুর থাকা তো দরকার।'

অনেক পরামর্শের পর লগাকে পাঠানো হল। রাতটা সে মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের পার্থিব সম্পত্তিগুলি পাহারা দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জবা আর টিয়ার সঙ্গে হিরণ্ময় আবার 'ভুবন ফার্মেসি'তে এল। সঙ্গে সেই ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগটা তো রয়েছেই, তা ছাড়া এনেছে একটা বড় সুটকেশ। সুটকেশটা খুলে নানারকম যন্ত্রপাতি আর ফিতে বার করে ভুবনের হাতে পায়ে বুকে লাগিয়ে কী একটা কল চালিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লম্বাটে ফালি কাগজে উঁচু নিচু দাগ পড়তে লাগল। দমবন্ধ করে কেষ্টভামিনীরা সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় কাগজটা বার করে চোখের সামনে ধরে কী যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে হিরণ্ময়। তারপর বলে, 'কাল সকালে এসে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করব। রোগী যেমন শুয়ে আছে তেমনি থাকবে। নাড়াচাড়া করবেন না।'

কেষ্টভামিনী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?'

উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসে হিরণ্ময়। তার ওই হাসিটাই বুঝিয়ে দেয়, ভুবনের অবস্থা আশাপ্রদ কিছু নয়।

ভুবনকে আরও একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে হিরণ্ময় চলে যায়। আর ভুবনের বিছানার চারপাশ ঘিরে মেঝেতে চুপচাপ বসে থাকে মেয়েমানুষগুলো। সেই দুপুরে খেয়েছে তারা, তারপর এতটা রাত হল। স্বাভাবিক নিয়মেই খিদে পাওয়া উচিত। কিন্তু খিদে তেষ্টার কোনও বোধই এখন তাদের নেই। মনে মনে তারা বিড় বিড় করতে থাকে, 'হেই মা কালী, বাবামাশায়রে সারায়ে দাও। হেই মা—'

মাঝরাতে চারদিক যখন আরও নিঝুতি হয়ে যায়, অন্ধকারে আর কুয়াশায় যখন ডুবে যায় সমস্ত চরাচর, সেই সময় শিকারী কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে একদল মাতাল লুচচা এসে হানা দেয় 'ভুবন ফার্মেসি'তে। মেয়েপাড়ার জবা টগরদের না পেয়ে তারা এখানে হানা দিয়েছে। সেই আদিম জৈব প্রবৃত্তি, তার তো বিনাশ নেই।

বেহুঁশ, রোগাক্রান্ত বাবামাশায়ের আরোগ্য কামনায় সাতাশটি মেয়েমানুষ তদ্গত হয়ে যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে তখন এই জন্তুগুলো এসে পড়ায় তারা মারাত্মক খেপে ওঠে। জানোয়ারেরা তাদের টেনে হেঁচড়ে মেয়েপাড়ায় নিয়ে যাবে, তারা যাবে না। এই নিয়ে মধ্যরাতের স্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে দু-পক্ষে তুমুল গালাগাল চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মেয়েমানুষগুলো আঁচড়ে, কামড়ে, লাথি মারতে মারতে লুচ্চার পালকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর বাকি রাতটা নির্বিঘ্নেই কেটে যায়।

সেই যে ভুবন চক্রবর্তী চোখ বুজে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে ছিল তার কোনও হেরফের ঘটেনি। জ্ঞান ফেরেনি তার, বরং মুখের বাঁ ধারটা আরও খানিকটা বেঁকে যেন শক্ত হয়ে গেছে।

মেয়েমানুষগুলো সারারাত কেউ দু'চোখের পাতা এক করে নি। পলকহীন ভুবনের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল।

ভুবনকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা আমূল কেঁপে যায় কেষ্টভামিনীর। বার বার আবছাভাবে কেউ যেন জানিয়ে দেয় লক্ষণটা

ভাল নয়। ভুবনের মুখের ওপর ঝুঁকে সে কাঁপা গলায় ডাকতে থাকে, 'বাবামাশায়, বাবামাশায়—'

সাড়া নেই।

এবার ভুবনের বুকে কপালে হাত দিয়ে চমকে ওঠে কেষ্টভামিনী। শরীরটা বরফের মতো ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে। দ্রুত হাত সরিয়ে অন্য মেয়েদের বলে, 'আমি ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছি।'

এই ভোরবেলায়, রাস্তা একেবারে ফাঁকা, কোথাও জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না। রিকশার চিহ্নমাত্র নেই। অগত্যা একরকম দৌড়ুতে দৌড়ুতেই কেষ্টভামিনী বাজার পাড়ায় এসে হিরণ্ময় ডাক্তারের ঘুম ভাঙায়।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে হিরণ্ময় নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল। সাতসকালে কেষ্টভামিনীকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?'

কেষ্টভামিনী বলে, 'আমার বড্ড ভয় করচে ডাক্তারবাবু। আমার সনগে দয়া করে চলেন—'

'রোগীর জ্ঞান ফিরেছিল?'

'না।'

কিছু একটা আন্দাজ করে নেয় হিরণ্ময়। আর কোনও প্রশ্ন না করে বলে, 'রাস্তায় গিয়ে দেখুন দুটো রিকশা পাওয়া যায় কিনা। আমি আসছি।'

এর মধ্যে রোদ উঠে গিয়েছিল। দু-চারটে রিকশাও বেরিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ বাদে হিরণ্ময় ডাক্তারকে সঙ্গে করে 'ভুবন ফার্মেসি'তে ফিরে আসে কেষ্টভামিনী।

ভুবনের গায়ে একবার হাত দেয় হিরণ্ময়, তারপর দ্রুত নাকের কাছে হাতটা এনে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াটি বুঝতে চেষ্টা করে। পরক্ষণে স্টেথোসকোপ বুকে লাগিয়েই তুলে নেয়। তার মুখে হতাশা আর বিষাদের ছাপ ফুটে উঠতে থাকে।

সাতাশটি মেয়েমানুষের হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন থেমে গিয়েছিল। শঙ্কাতুর মুখে একদৃষ্টে তারা তাকিয়ে আছে হিরণ্ময়ের দিকে।

কেষ্টভামিনী একসময় রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?'

বিমর্ষ সুরে হিরণ্ময় বলে, 'কিছুই করা গেল না। ভুবনবাবু মারা গেছেন।'

'ভুবন ফার্মেসি'র টিনের চালের প্রকাণ্ড ঘরটার ভেতর সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দমকা হাওয়ার মতো শোকের উচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ে। সাতাশটি মেয়েমানুষ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

এই শোকের পরিবেশেই কাগজে কী যেন লিখে কেস্টভামিনীকে দিতে দিতে হিরণ্ময় বলে, 'এটা ডেথ সার্টিফিকেট। ভুবনবাবুকে সৎকার করতে নিয়ে গেলে শ্মশানে এটা লাগবে।'

আচ্ছন্নের মতো হাত বাড়িয়ে সার্টিফিকেটটা নেয় কেস্টভামিনী।

মেডিক্যাল ব্যাগটা আজ আর খুলতে হয়নি। সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে হিরণ্ময় বলে, 'আচ্ছা চলি—'

আঁচলের গিঁট খুলে টাকা বার করতে করতে কেস্টভামিনী বলে, 'আপনার ট্যাকাটা ডাক্তারবাবু—'

কী ভেবে হিরণ্ময় বলে, 'থাক। ওটা আর দিতে হবে না।' বলে চলে যায়।

এদিকে প্রাথমিক শোকের উচ্ছ্বাস কিছুটা থিতিয়ে এলে কেস্টভামিনী বলে, 'এখন কী করা—হ্যাঁ রে মেয়েরা?' আসলে ভুবনের এমন আচমকা মৃত্যুতে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। কী করবে, কী করা উচিত, ভেবে উঠতে পারছে না।

মেয়েমানুষগুলোর মনের অবস্থাও কেস্টভামিনীর মতোই, বিহ্বলের মতো তার দিকে ওরা তাকিয়ে থাকে।

বেলা ক্রমশ বাড়ছিল। সূর্য পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। গাঢ় কুয়াশা কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদে ভরে গেছে চারিদিক।

মৃত্যুর গন্ধ কিভাবে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়। সুরকিকল ধানকল আর বড় বড় গুদামের মজুরেরা একজন দু'জন করে 'ভুবন ফার্মেসি'র সামনে এসে জড়ো হতে থাকে। তাদের কেউ কেউ চাপা শব্দ করে কাঁদছিল, কেউবা হাতের পিঠে চোখের জল মুছছিল। আসলে ভুবন চক্রবর্তীর মতো আপনজন তো তাদের কেউ ছিল না।

মেয়েমানুষগুলো মুহ্যমানের মতো দলা পাকিয়ে বসে আছে। কেষ্টভামিনী বলে, 'কী রে, তোরা চুপ করে আচিস কেন? কিছু বল—' বাইরে থেকে তাকে যতই জবরদস্ত মনে হোক, আসলে মানুষটা ভেতরে ভেতরে খানিকটা দুর্বল, বিশেষ করে মৃত্যু টৃত্যুর ব্যাপারে খুব অস্থির হয়ে পড়ে।

বয়স কম হলেও মেয়েপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথা মুক্তোর। বয়স তিরিশ বত্রিশ। শ্যামলা চেহারার শান্তশিষ্ট মেয়েমানুষটি মেয়েপাড়ার অন্য বাসিন্দাদের থেকে একটু আলাদা। সে বলে, 'বাবামাশায়রে তো এখেনে ফেলে রাখা যাবে নি, শ্মশানে নে যেতি হবে কিন্তুন—'

কেষ্টভামিনী বলে, 'কিন্তুন কী?'

'বাবামাশায়ের ভাইরা তো এই শহরে থাকে। এ সময়ে তেনাদের খবর না দিলে আমরা পাপের ভাগী হয়ে থাকব। তাছাড়া মুখে আগুন দেবার জন্যি নিজেদের লোক দরকার।'

এই কথাটা আগে মাথায় আসে নি কেষ্টভামিনীর। সত্যিই তো, শেষ সময়ে ছেলে, ভাই বা রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের হাতের আগুনটুকু না পাওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। বাবামাশায় তাদের যতই কাছের মানুষ হোক, তার ভাইদের এই অন্তিম মুহূর্তে খবর দিতেই হবে। কেষ্টভামিনী বলে, 'ঠিক বুলেচিস। আমি নিজে যাব তেনাদের কাচে। কিন্তুন—' বলতে বলতে হঠাৎ দমে যায়।

'কী?'

'বাবামাশায়ের সন্‌গে ওনাদের তো কোনও সম্পক্ক ছিল নি। অ্যাদ্দিন পর গিয়ে বুললে কি আসবে?'

'আমাদের দিক থেকে এট্টা কত্তব্য তো আচে। এলে এল, না এলে আর কী কবব! মনকে বুঝোতে পারব, আমরা তিরুটি (ত্রুটি) করি নি।'

কাজেই একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রিকশায় করে বেরিয়ে পড়ে কেষ্টভামিনী। বহুকাল আগে সারা গায়ে পারার ঘা নিয়ে প্রথম যে বাড়িতে ভুবন চক্রবর্তীর সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছিল, ভুবনের ভাইরা এখনও সেখানেই আছে।

মহারাজপুর মাঝখানের পঁচিশ তিরিশ বছরে অনেক বদলে গেছে কিন্তু ভুবন চক্রবর্তীদের পৈতৃক বাড়িটা সেই আগেই মতোই আছে। ঠিক আগের মতো নয়, আরও পুরনো এবং জীর্ণ হয়েছে। দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে খসে যে ইট বেরিয়ে পড়েছে সেগুলোতে নোনা লেগে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানিই এগিয়ে আছে। ওটা যে ভাগের বাড়ি, একটু লক্ষ করলেই টের পাওয়া যায়। সর্বত্র অযত্ন আর উদাসীনতার ছাপ।

বাড়িটার কাছে রিকশা থামিয়ে নেমে পড়ে কেষ্টভামিনী। যেখানে একদা 'ভুবন ফার্মেসি' ছিল, এখন সেটা একটা লন্ড্রি। হয়ত ভুবনের ভাইরা ভাড়া দিয়েছে লন্ড্রিওলাকে।

ভয়ে ভয়ে সদর দরজায় কড়া নাড়তে একটা মধ্যবয়সী থলথলে চেহারার লোক বেরিয়ে আসে। চোখমুখের যা ছাঁচ তাতে তাকে ভুবন চক্রবর্তীর ভাই বলে সহজেই শনাক্ত করা যায়।

কেষ্টভামিনীকে দেখামাত্র ঘৃণায় লোকটির কপাল কুঁচকে যায়। কেষ্টভামিনী কোত্থেকে আসছে সেটা না বলে দিলেও চলে। মেয়েপাড়ার জীবনযাপনের চিরস্থায়ী ছাপ তো আর মুখ থেকে এ জন্মে তুলে ফেলা যাবে না।

লোকটি যে খুবই তেরিয়া মেজাজের সেটা তার গলা শুনেই টের পাওয়া যায়, 'কী চাই ?'

বুক কাঁপছিল কেষ্টভামিনীর। হাতজোড় করে সে বলে, 'বাবামাশায় মারা গেচে।'

লোকটা খেঁকিয়ে ওঠে, 'কে বাবামাশায় ?'

'ভোবন—ভোবন চক্কোত্তি মাশায়।'

লোকটা এবার চেঁচাতে গিয়েও থমকে যায়। এদিকে তার চিৎকার শুনে আরও কয়েক জন বাড়ির ভেতর থেকে, সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে মেজদা?'

লোকটা বলে, 'এই মাগীটা বলছে, দাদা নাকি মারা গেছে।'

কেষ্টভামিনী বলে, 'তেনারে শ্মশানে নে যেতি হবে। মুখে আগুন দেওয়ার জন্যি আপনার লোক দরকার। তাই—'

লোকটা অন্য ভাইদের সঙ্গে নিচু গলায় ফিস ফিস করে কী পরামর্শ করে নেয়। তারপর ঝাঁঝালো স্বরে বলে, 'বেশ্যার নাড়ি টিপে যে এতকাল বেঁচে ছিল তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। যাও, ভাগো—'

'কিন্তুন মুখের আগুন—'

কথা শেষ হবার আগে দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কেষ্টভামিনী কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ক্লান্তভাবে পা টেনে টেনে রিকশায় গিয়ে ওঠে।

ভুবন ফার্মেসিতে ফিরে এসে কেষ্টভামিনী সব জানালে অন্য মেয়েমানুষরা বলে, 'এখুন তা হলে উপায়?'

কেউ উত্তর দেয় না।

অনেকক্ষণ পর কেষ্টভামিনী বলে, 'আমি একটা কথা ভেবেছি।'

'কী?'

'কারোরে য্যাখন পাচ্চি না, বাবামাশায়ের মুখে আমরাই আগুন দেব।'

মেয়েমানুষগুলো ভীষণ চমকে ওঠে। টগর বলে, 'কিন্তুন বাবামাশায় যে বামুন।' অর্থাৎ তাদের কাছে ব্রাহ্মণের মুখাগ্নি করার মতো মহাপাপ আর হয় না।

ভুবন চক্রবর্তীর ভাইদের কাছে যাবার আগে কেষ্টভামিনীর মধ্যে যে দুর্বলতা আর দিশেহারা ভাবটা ছিল সেটা এর মধ্যে অনেকখানি কাটিয়ে নিয়েছে সে। কেষ্টভামিনী জানায়, বামুন হোক আর যা-ই হোক, ভুবন

চক্রবর্তী তাদের বাবামাশাই। জন্মটাই নেহাৎ দেয়নি, নইলে পিতার যাবতীয় কর্তব্যই অকাতরে পালন করে গেছে। মৃত্যুর পর মুখাগ্নি ছাড়া তার সৎকার হবে, তা ভাবা যায় না। মুখে সামান্য একটু অগ্নিস্পর্শের জন্য ভুবনের পরলোকের পথ দুর্গম হয়ে উঠুক সেটা একেবারেই চায় না সে।

মেয়েমানুষগুলোর দ্বিধা তবু কাটে না। তারা বলে, 'কিন্তন—'

কেষ্টভামিনী বলে, 'লরকে তো ডুবেই আচি। বামুনের মুখে আগুন ঠেকিয়ে আর কত ডুবব! মরার পর আমাদের কী হবে. তা লিয়ে ভেবে কী হবে!'

মেয়েরা আর আপত্তি করে না।

কাজেই খেলো কাঠের সস্তা একখানা খাট আসে, সেই সঙ্গে ফুল, খই। সযত্নে খাটে তোলা হয় ভুবনকে।

আরও কিছুক্ষণ পর এ অঞ্চলের মানুষজন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে সাতাশটি ওঁচা মেয়েমানুষ খই ছড়িয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে খাটে শায়িত ভুবন চক্রবর্তীর নশ্বর দেহ কাঁধে তুলে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমন দৃশ্য মহারাজপুরে আগে আর ক'নও দেখা যায়নি।

শ্মশানটা শহরের শেষ মাথায় একটা মজা নদীর পাড়ে। সেখানে এসে ডোমকে দিয়ে চিতা সাজায় কেষ্টভামিনীরা। কাছাকাছিই থাকে শ্মশানের পুরুত নীলকণ্ঠ ভটচায। টগর গিয়ে তাকে ডেকে আনে।

একসময় মন্ত্র পড়ে সাতাশটি মেয়েকে দিয়ে ভুবনের মুখাগ্নি করায় নীলকণ্ঠ। তারপর ডোম, যার নাম জগা—চিতায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

ভুবনের দেহ এই পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর মেয়েমানুষগুলো নদীতে স্নান করে মেয়েপাড়ায় ফিরে যায়।

কয়েক দিন বাদে শ্মশানের লাগোয়া নদীর পাড়ে সকাল বেলায় শ্রাদ্ধের আসর বসে। সাতাশটি মেয়ে স্নান করে নতুন কাপড় পরে, শুদ্ধ মনে জোড়হাতে আসর ঘিরে বসে থাকে।

সবার বড় বলে শ্রাদ্ধের অধিকারটা কেষ্টভামিনীর ওপরেই বর্তেছে। পুরুত নীলকণ্ঠ ভটচাযের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে মন্ত্র পড়ে যায় ...........

'ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভবঃ।

নমঃ আকাশস্থঃ নিরালম্বঃ বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ।

ইদং নীরমিদং—'

মন্ত্রোচ্চারণের একটানা গম্ভীর সুর সমস্ত চরাচরের ওপর ছড়িয়ে যেতে থাকে।

---

## গন্তব্য

শেষ রাতে, কাকপক্ষী তখনও জাগেনি, কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা—বিলোনিয়া থেকে মোটর গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়েছিলেন জনকলাল মিশ্র। তিনি যাবেন অনেকটা পথ, চল্লিশ মাইল দূরের এক নগণ্য টাউন নহরপুরায়। সেখানে তাঁর মেয়ে পার্বতীর শ্বশুরবাড়ি। মেয়ের শ্বশুর চতুরাননজির সঙ্গে আজ তাঁকে দেখা করতেই হবে। চিঠিতে তিনি সেই রকমই জানিয়ে দিয়েছেন। এই দেখা হওয়াটার ওপর পার্বতীর ভবিষ্যৎ, তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

নহরপুরায় তাঁর ছোট শালা মহেশ্বরও থাকে। চতুরাননজির সঙ্গে জরুরি কাজ সেরে রাতটা তার কাছে কাটিয়ে কাল সকালে জনকলাল নিজের গাঁয়ে ফিরবেন। নহরপুরা থেকে পুব দিকে আরও মাইল দশেক গেলে তাঁদের গাঁ।

যে যানটিতে জনকলাল চলেছেন, মোটর গাড়ি তৈরির সেই আদি যুগে খুব সম্ভব সেটি সৃষ্টি হয়েছিল। গাড়িটার প্রথম চেহারা কেমন ছিল বলা মুশকিল। ড্রাইভারের সিট থেকে সামনের দিকটা হয়তো আগের মতোই আছে। ঢাউস একটা স্টিয়ারিং, মরচে ধরা টুটোফুটো ঢাকনির তলায় লঝ্ঝড় ইঞ্জিন, তার দু-ধারে বেঢপ দুটো হেড লাইট, তোবড়ানো মাডগার্ড—এগুলো ছাড়া আগেকার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। ছাদ কবেই ভেঙেচুরে গেছে, সেই জায়গায় বয়েল গাড়ির ছইয়ের মতো তেরপলের ছাউনি। সেটার তলায়, ড্রাইভারের সিটের লাগোয়া, কাঠের পাটাতন বসিয়ে তার ওপর পুরু করে চট পেতে বসার ব্যবস্থা। পেছন দিকটা একেবারে ফাঁকা।

মৃগী রুগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে চলেছে গাড়িটা। ইঞ্জিন থেকে হিক্কার মতো এমন আওয়াজ বেরুচ্ছে, মনে হয়, সেটার অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতে আর দেরি নেই।

বিলোনিয়া থেকে নহরপুরা, এই চল্লিশ মাইল রাস্তা এই গাড়ির পক্ষে একটানা দৌড়নো অসম্ভব। দু চার মাইল যাবার পর ইঞ্জিনটা থেকে গেলে

অন্তত আধ ঘণ্টা জিরোতে দিতে হবে। এইভাবে থেমে থেমে লম্বা সফর শেষ করে নহরপুরায় পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে যাবে।

সামনের দিকে স্টিয়ারিং হাতে করে বসে আছে মুসাফির। হট্টাকট্টা জোয়ান, মাথায় পাগড়ির মতো করে গামছা জড়ানো। আর পেছনে ছাউনির তলায় বসেছেন জনকলাল। তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। গোলগাল, ভারী চেহারা, গোলাকার মুখ, টকটকে রং, বড় বড় চোখ। মাথার পেছন দিকে এক গোছা মোটা টিকির আগায় ফুল বাঁধা, কপালে তিন লাইন শ্বেত চন্দন, কানের লতিতেও চন্দনের টিপ। পরনে ধুতি আর হাফ হাতা পাঞ্জাবি।

জনকলাল ঘোর নিষ্ঠাবান শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ, ছুয়াছুত এবং জাতপাতের বাছবিচার তাঁর অত্যন্ত প্রবল। ব্রাহ্মণত্বের যাবতীয় গোঁড়ামি এবং সংস্কার তিনি দু হাতে আগলে রেখেছেন।

চাকরি বাকরি কখনও করেননি। স্বাধীন ভারতে অফিসগুলোর যা হালচাল সে সম্বন্ধে জনকলাল প্রচণ্ড হতাশ এবং শঙ্কিত। নিত্যনতুন যে সব কানুন বেরুচ্ছে তাতে নিচু বর্ণের আর মাইনোরিটি কমিউনিউটির লোকেরা মাথায় চড়ে বসছে। তাদের পাশে বসে গায়ে গা ঠেকিয়ে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর ধারণা, সারা দেশ জুড়ে ব্রাহ্মণদের হেয় করার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। এটুকুই বাঁচোয়া, এই ঘোর দুর্দিনেও সবাই নষ্ট হয়ে যায়নি, অনেকের মধ্যেই ঈশ্বরের এবং ব্রাহ্মণের প্রতি কিঞ্চিৎ ভক্তিশ্রদ্ধা এখনও থেকে গেছে। তাই লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পূজা, যাগযজ্ঞ এবং শাস্ত্রপাঠ করে নিজের সংসারটা মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারছেন।

দিন সাতেক আগে বিলোনিয়ায় এসেছিলেন জনকলাল। গঙ্গার একটা ফ্যাকড়া নানা পথ ঘুরে এখানে চলে এসেছে, তারই পাড়ে বিলোনিয়া হল মস্ত এক গঞ্জ।

গত তিন সাল এ অঞ্চলে এক নাগাড়ে মারাত্মক খরা গেছে। বর্ষায় একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি, জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেছে চারদিক। এ বছরও যদি বৃষ্টি না নামে, মানুষ বাঁচবে না। আকাশের রুষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন করতে বিলোনিয়ার আড়তদার, দোকানদার এবং চারপাশের গাঁওবালারা

যজ্ঞের আয়োজন করেছিল। আর সেটা নিঁখুত শাস্ত্রসম্মতভাবে করার জন্য তারা জনকলালকে এখানে নিয়ে আসে।

যজ্ঞ শেষ হয়েছিল কাল বিকেলে। রাতটা পার করেই আজ তিনি রওনা হয়েছেন। তবে বিলোনিয়ার মানুষজন অনেক বাধা দিয়েছিল। কেননা যে পথ দিয়ে তিনি নহরপুরায় যাবেন সেখানকার আবহাওয়া নাকি হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছে। মাসখানেক আগে ওখানে বিরাট দাঙ্গা হয়েছিল। খুনজখম হয় প্রচুর। সি আর পি নামার পর অবশ্য সব ঠিক হয়ে আসে।

সাতদিন আগে জনকলাল যখন তাদের গাঁ থেকে নহরপুরার পাশ দিয়ে এখানে আসেন, ওই জায়গাগুলোতে নতুন করে গোলমালের কোনও লক্ষণ দেখতে পাননি। কিন্তু চাপা একটা উত্তেজনা নাকি ভেতরে ভেতরে ছিলই, যজ্ঞ চলার সময় এমন কিছু ঘটেছে যাতে দাঙ্গাটা যে কোনও সময় বেধে যেতে পারে। বিলোনিয়ার লোকগুলো বার বার বুঝিয়েছিল, জনকলাল যেন আরও দু-চারটে দিন থেকে অবস্থা ভাল বুঝলে বাড়ি ফেরেন। এত হুঁশিয়ারিতেও কান দেননি তিনি, পার্বতীকে বাঁচাবার জন্য আজ তাঁকে নহরপুরায় যেতেই হবে। ওর বিয়ের সময় কথামতো দহেজ বা যৌতুক দিতে পারেননি, সেই কারণে শ্বশুর-শাশুড়ি ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে। স্পষ্ট করে মেয়েটা সব জানায় না, তবু আন্দাজ করা যায়, মারধরও শুরু হয়ে গেছে। জনকলাল জানিয়ে দিয়েছেন আজ পার্বতীর শ্বশুরের হাতে কিছু টাকা দিয়ে আসবেন। দাঙ্গা যদি সত্যিই ফের বেধে যায় কী আর করা যাবে। তা ছাড়া খানিকটা আত্মবিশ্বাসও রয়েছে জনকলালের। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ, এ দিকের পঞ্চাশ ষাট মাইলের ভেতর প্রায় সবাই তাঁকে চেনে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর ধারণা কেউ তাঁর ক্ষতি করবে না।

বিলোনিয়া পেছনে ফেলে অনেক দূর চলে এসেছেন জনকলালরা। তাঁদের বিদঘুটে মোটরটা এখন উঁচু নিচু কাঁকুরে রাস্তার ওপর দিয়ে টাল খেতে খেতে চলেছে।

ছইয়ের তলায় গাড়ির হটরানিতে বসে থাকতে থাকতে কাত হয়ে গিয়েছিলেন জনকলাল। তাঁর পাশে বিপুল লটবহর ডাঁই হয়ে আছে।

পনেরো জোড়া নতুন ধুতি আর শাড়ি, চাল ডাল আলুর তিনটে মুখ-বাঁধা বস্তা, একটিন খাঁটি ভয়সা ঘি, এক টিন ঘানিতে ভাঙা সরষের তেল, গণ্ডা দশেক নারকেল, এক ঝুড়ি সুপুরি, প্রচুর বাসন-কোসন, এ ছাড়া টুকিটাকি আরও অনেক কিছু।

জনকলাল কখনও কারও কাছে হাত পাতেন না, পুজো টুজো করিয়ে যে যা দেয় তাই নেন। কিন্তু পাবতীর চিন্তাটা মাথায় রেখে যজ্ঞ বাবদ এ বার দক্ষিণা একটু বেশিই চেয়েছিলেন। বিলোনিয়ার মানুষজন তাঁকে নিরাশ করেনি, বরং যা দিয়েছে তা একেবারে আশাতীত। চালডাল কাপড়চোপড় ছাড়াও জনকলাল পেয়েছেন নগদ পাঁচ হাজার টাকা। একটা যজ্ঞ করে এত টাকা পাওয়া যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল। এটা তাঁর প্রায় ছ মাসের রোজগার।

সামনের দিকে পিঠ খাড়া রেখে মুসাফির স্টিয়ারিংটা শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু বেয়াড়া মোটরটাকে কিছুতেই বাগে রাখতে পারছে না। নিজের ইচ্ছামতো সেটা লাট খেতে খেতে রাস্তার ধারের দিকে প্রায়ই চলে যাচ্ছে। দু পাশেই দশ বারো ফুট নিচে শুকনো খাল, একবার সেখানে হুড়মুড় করে পড়লে দেখতে হবে না, গাড়ির সঙ্গে সওয়ারিরাও খতম। দাঁতে দাঁত চেপে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মোটরটাকে রাস্তার মাঝ বরাবর রাখতে চেষ্টা করছে মুসাফির। তার মুখ থেকে বিরক্তিসূচক অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, 'উর-র-র, অ-হ্-অ-অ-অ— শালে মোটরিয়া, ভূচ্চরকা ছৌয়া মোটরিয়া— তেরা জান লে লেগা। উর-র-র—' এ ভাবে গলায় সুরের লহর তুলে এতটা পথ এসেছে সে, নহরপুরা পর্যন্ত ঠিক এইভাবেই চালিয়ে যাবে।

মুসাফির একসময় বেশ কয়েক বছর জনকলালের বাড়িতে থেকে তাঁর বয়েল গাড়ি চালাত। পরে পূর্ণিয়া শহরে গিয়ে মোটর ড্রাইভিং শিখে এখন এই মোটরটা চালাচ্ছে। জনকলাল কাছাকাছি কোথাও পুজোআর্চা করতে গেলে নিজের গো-গাড়িতেই যান। কিন্তু দূরে যেতে হলে মুসাফিরকে খবর পাঠান। সে এসে নিয়ে যায় এবং বাড়িতেও পৌঁছে দেয়, যেমন আজ দিচ্ছে। যজমানদের সঙ্গে কথাই থাকে, তারা মুসাফিরের গাড়ি-ভাড়া আর খোরাকি দেবে।

আবছাভাবে মুসাফিরের চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিলেন জনকলাল। আসলে পার্বতীর চিন্তাটাই তাঁর মাথায় চেপে বসে আছে। অন্য কোনও দিকে বিশেষ নজর নেই। নিজের অজান্তেই একবার পাঞ্জাবির ভেতরের পকেটে হাত দিলেন। সেখানে একশো টাকার পঞ্চাশখানা কড়কড়ে নতুন নোট সযত্নে রাখা আছে। এই টাকাটা মনের জোর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর। পার্বতীর শ্বশুরবাড়ির জন্য আগেই দু হাজার টাকা জমিয়েছিলেন। গাঁ থেকে বিলোনিয়ায় আসার সময় সেটা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সেই টাকাটা রয়েছে পাঞ্জাবির ডান পকেটে। পাঁচের সঙ্গে দুই যোগ করে দাঁড়াল সাত। আপাতত এই সাত হাজার নিয়ে নহরপুরায় গেলে কিছুদিনের জন্য অন্তত মেয়েটার আয়ু নির্বিঘ্ন করা যাবে। এর পর আরও তেরো হাজার দিতে হবে। কিন্তু পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

পকেট থেকে হাত সরিয়ে এবার ছইয়ের বাইরে তাকান জনকলাল। বেশ কিছুক্ষণ আগেই সকাল হয়েছে। কুয়াশার ঝালর দিয়ে মোড়া ছিল চরাচর, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। দিগন্তের তলা থেকে সূর্যটা আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। জ্যৈষ্ঠের এই সকালেও রোদের কী তেজ! বাতাস এর মধ্যেই বেশ তেতে উঠেছে।

রাস্তার দু ধারে মজা খালের ওপারে মড়ুঞ্চে চেহারার গাছপালা। পাতা শুকিয়ে শুকিয়ে তাদের গা থেকে কবেই খসে গেছে, শুধু জীর্ণ খসখসে ডালগুলো আকাশের দিকে কাতরভাবে হাত বাড়িয়ে রয়েছে। চারপাশের ফসলের খেতগুলো ফেটে ফেটে চৌচির। ক্বচিৎ দু-চারটে টালি বা খড়ের চালের ঘর চোখে পড়ে কিন্তু মানুষজন কোথাও নেই। যে ধারে যতদূর নজর যায়, সমস্তই ধূসর, রুক্ষ, ঝলসানো। শুধু মাটির ওপর দিকটাই না, ভেতরের অতল স্তর পর্যন্ত বুঝি বা শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে। আর কোনওদিন এখানকার মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্র চোখজুড়ানো শ্যামলিমায় ভরে যাবে, তা যেন নেহাতই দুরাশা।

কোথায় একটা পাখি নিজেকে গোপন রেখে থেকে থেকে ডেকে উঠছে—কুক, কুক, কুক। নিঝুম চরাচরে ডাকটা আশ্চর্য বিষাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে যেন।

অকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পশ্চিম আকাশের দিকে চোখ যেতে চকিত হয়ে ওঠেন জনকলাল। দু-চার টুকরো কালচে মেঘ সেখানে এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। কাল যজ্ঞ শেষ করেছেন, আজ সকালেই এ বছরের প্রথম মেঘ দেখা দিল। যজ্ঞের এমন নগদ ফল দেখে তাঁর গায়ে কাঁটা দেয়।

উত্তেজনায় শিরদাঁড়া টান টান হতে যাচ্ছিল জনকলালের, সেই সময় মুসাফিরের মোটা খসখসে গলা শোনা যায়, 'পণ্ডিতজি—' এই নামেই জনকলালকে এ অঞ্চলের সবাই ডেকে থাকে।

মুখ ফিরিয়ে ছইয়ের তলা দিয়ে মুসাফিরের দিকে তাকান জনকলাল, 'কী বলছিস ?'

মুসাফির বলে, 'হামনিলোগ ঠিক নেহি কিয়া।'

জনকলালের কপাল কুঁচকে যায়। বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'বেঠিকটা কী করলাম ?'

'আউর দো-চার রোজ বিলোনিয়ায় থেকে গেলে ভাল হত। আড়তবালারা, দুকানদাররা এত করে বলল। আপনি শুনলেনই না !'

'জানিস না, আজ আমার নহরপুরায় না গেলেই নয় !'

মুসাফির জনকলালদের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে। মাস ছয়েক না হয় সে পূর্ণিয়ায় রয়েছে, তার আগের সাত সাতটা বছর তো জনকলালের বাড়িতেই কেটেছে তার। আজ তিনি নহরপুরায় না গেলে পার্বতীর জীবন যে বিপন্ন হয়ে উঠবে, সেটা তাকে মনে না করিয়ে দিলেও চলত। বলে, 'হাঁ হাঁ, সব কুছ জানি। লেকেন—'

জনকলাল বলেন, 'তোর মাথায় দাঙ্গার চিন্তাটা ঘুরছে—তাই না ?'

'জরুর।' গলায় বেশ জোর দিয়ে বলে মুসাফির।

জনকলাল অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। দু ধারের ফাঁকা মাঠের দিকে দু হাত বাড়িয়ে বলেন, 'কোথায় দাঙ্গা ! দেখা না, দেখা—'

মুসাফির ঘাড় ফিরিয়ে জনকলালকে লক্ষ করে। বেশ রুক্ষ স্বরে বলে, 'আপকা কান নেহি, বিলকুল বহির (কালা) হো গিয়া— ক্যা ?'

প্রাক্তন হলেও মনিব তো, তাঁর সঙ্গে এই সুরে এভাবে কেউ কথা বলে না। কিন্তু মুসাফিরের ব্যাপার আলাদা। এমনিতে একটু গোঁয়ার গোছের

হলেও খুবই সৎ। তার চেয়ে বড় ব্যাপার, জনকলালদের সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তবে অনেকদিন এক বাড়িতে থাকার কারণে বেশ খানিকটা মাথায় চড়ে বসেছে। জনকলালের মুখের ওপর কথা বলতে সে ছাড়ে না। আশকারাটা অবশ্য বরাবর তিনি আর তাঁর স্ত্রীই দিয়ে এসেছেন।

জনকলাল হঠাৎ ভীষণ রেগে যান, গলার স্বর অনেকটা চড়িয়ে বলেন, 'মুখ খুব বেড়ে গেছে! তোর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না।'

মুসাফিরকে দেখে মনে হয় না, আদৌ বিচলিত হয়েছে। এমন শাসানি বহুবার শুনেছে সে। এ সব ফাঁকা আওয়াজ। বলে, 'অত গুসসা করবেন না, শির ঠাণ্ডা করে শোনার চেষ্টা করুন।'

একটু কৌতূহল হলেও রুখে ওঠেন জনকলাল, 'কী শুনব?'

উত্তর দেওয়া দরকার মনে করে না মুসাফির। মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকায়।

এবার ভেতরে ভেতরে কিছুটা থতিয়ে যান জনকলাল। অনেক বার প্রমাণ পেয়েছেন মুসাফিরের চোখকান খুব তীক্ষ্ণ, একেবারে কুকুরের মতো সজাগ। নিশ্চয়ই কিছু একটা শুনেছে সে। জনকলাল কান খাড়া করেন।

গাড়িটা এখন বেশ আস্তে আস্তে চলেছে। খুব সম্ভব ইচ্ছা করেই ওটার স্পিড কমিয়ে দিয়েছে মুসাফির।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে জনকলালের মনে হল, খুব অস্পষ্টভাবে কোত্থেকে যেন হইচই-এর শব্দ ভেসে আসছে। জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের আওয়াজ রে?'

চাপা বিদ্রুপের ভঙ্গিতে মুসাফির বলে, 'শুনতে পেয়েছেন তা হলে?'

'হাঁ হাঁ, শুনেছি। কারা চেল্লামিল্লি করছে?'

'কী করে বলব! আপনি যেখানে, আমিও সেখানে। তবে কিছু গড়বড় মালুম হচ্ছে।'

জবাব না দিয়ে শব্দটার উৎস এবং কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন জনকলাল।

মুসাফির বলে, 'কী করব, গাড়ি ঘুরিয়ে বিলোনিয়া ফিরে যাব?'

এবার রীতিমত ঝাঁঝিয়ে ওঠেন জনকলাল, 'কোথায় কারা চিল্লাচ্ছে আর তুই ফেরার মতলব করছিস! আচ্ছা ডরপোক তো! যেমন যাচ্ছিস যা—'

অগত্যা গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

খানিক চলার পর সেই আওয়াজটা আর শোনা যায় না। মুখে মুসাফিরকে যাই বলুন, কিছুটা দুর্ভাবনা যে জনকলালের হয়নি তা নয়। এবার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে বলেন, 'কি রে, আর কিছু শুনতে পাচ্ছিস?'

মুসাফির বলে, 'নেহি। তবে হোঁশিয়ার থাকতে হবে।'

'হাঁ।'

ইঞ্জিনটা ভীষণ গরম হয়ে গিয়েছিল। ঢাকনি খুলে সেটা ঠাণ্ডা করা হয়। মিনিট কুড়ি পর আবার গাড়ি চলতে শুরু করে।

সূর্য এদিকে আরও অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। এখন আর মাথার ওপর তাকানো যায় না। গনগনে রোদে আকাশ যেন ঝলসে যাচ্ছে। গরম লু-বাতাস আগুনের ভাপ ছড়াতে ছড়াতে দিগন্তের ওপর দিয়ে উল্টোপাল্টা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে যেন।

যৌবনের গোড়া থেকে অক্লান্ত ভূপর্যটকের মতো চড়া রোদ বা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বিহারের এক প্রান্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন জনকলাল। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রোদ তাঁকে কষ্ট দেয় ঠিকই, তবে তিনি খুব কাতর হয়ে পড়েন না।

চলতে চলতে পার্বতীর চিন্তাটা আবার মাথায় ফিরে আসে। আজ সাত হাজার দেবার পর কাল থেকেই বাকি তেরো হাজারের জন্য একে ওকে ধরতে হবে। কতদিনে ওই টাকাটা জোগাড় করতে পারবেন, মৃত্যুর আগে আগে পেরে উঠবেন কিনা, কে জানে।

ভাবনাটা কিন্তু বেশি দূর এগোয় না, তার আগে আচমকা কোথায় যেন তুমুল হইচই শোনা যায়। চমকে মুসাফিরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে সামনে ডান পাশে প্রায় সিকি মাইল দূরে শন আর টিনের চালের প্রচুর বাড়িঘর। তার বেশির ভাগই এখন জ্বলছে। আর বুড়োবুড়ি, কাচ্চাবাচ্চা, যুবক-যুবতী—নানা বয়সের শ খানেক মানুষ সন্ত্রস্ত

পশুর মতো চিৎকার করতে করতে সে দিক থেকে মাঝখানের সড়ক পেরিয়ে উদভ্রান্তের মতো বাঁ ধারের বিশাল মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। তাদের পেছন পেছন লাঠি, বল্লম, দা, এমনি সব মারণাস্ত্র বাগিয়ে ধাওয়া করে চলেছে আরেকটা দল। অনুসরণকারী এই ঘাতকেরাও সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। কী তারা বলছে, এত দূর থেকে শোনা যায় না।

মুসাফির গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল। ঘুরে বসে বলে, 'অব কা হোগা পণ্ডিতজি?' ভয়ে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে।

দাঙ্গার কথা এতকাল শুনেই এসেছেন জনকলাল কিন্তু তার চেহারাটা এত কাছ থেকে এই প্রথম দেখে তাঁর মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে হিমের স্রোত বয়ে যায়। কাঁপা গলায় বলেন, 'চুপচাপ বসে থাক।'

দুটো দলই একসময় বাঁ দিকের মাঠ পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। দূরে ডান ধারে গ্রাম জ্বলছে, কেউ কোথাও নেই, সব সুনসান। জনকলাল বলে, 'তুরন্ত এই জায়গা পেরিয়ে চল।'

ভোর থেকে ঘণ্টা তিন চারেক চলার কারণে গাড়িটার জীবনীশক্তি অনেক ক্ষীণ হয়ে এসেছে। 'তুরন্ত' বললেও স্পিড তোলা যাচ্ছিল না। ধুঁকতে ধুঁকতে কোনওরকমে সেটা এগিয়ে চলে।

গ্রামটা পেরোবার পর দূরে আরও দু-চারটে দেহাত চোখে পড়ে। সেগুলো থেকেও ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওই জায়গাগুলোতেও দাঙ্গা হয়েছে।

জনকলাল আর মুসাফির এখন একটা কথাও বলছে না, দু'জনের শ্বাসক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে গেছে। কত দ্রুত এই অঞ্চলটা পেরুনো যায়, সেটাই তাদের একমাত্র চিন্তা।

কতক্ষণ চলেছিলেন, জনকলালের খেয়াল নেই। হঠাৎ রাস্তার ধার থেকে কে যেন ভীত, কাঁপা গলায় ডেকে ওঠে, 'পণ্ডিতজি—'

হকচকিয়ে যান জনকলাল। এধার ওধারে তাকাতেই দেখতে পান, সড়কের গা ঘেঁষে তিন বছরের তীব্র খরার পরও বুনো গাছের একটা বড় ঝোপ কীভাবে যেন টিকে আছে। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি যুবক আর একটি যুবতী। খুব সম্ভব স্বামী-স্ত্রী।

যুবকটির বয়স তেইশ চব্বিশ, রোগাটে লম্বা চেহারা। পরনে পাজামা আর নীল চেক-কাটা জামা, নাকের গোঁফ, খালি পা। মেয়েটির পরনে সস্তা ছিটের সালোয়ার-কামিজ। নাকে তার নাকফুল, কানে ঝুটো পাথর-বসানো করণফুল, হাতে রঙিন কাচের চুড়ি। দু'জনের চোখেমুখে ঘোর আতঙ্ক।

জনকলাল রুদ্ধস্বরে বলেন, 'কী, কী ব্যাপার?'

মুসাফির গাড়ি থামায়নি। পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে যুবক আর যুবতী হাতজোড় করে ব্যাকুলভাবে জনকলালকে বলে, 'বঁচাইয়ে পণ্ডিতজি, হ'মনিলোগকো বঁচাইয়ে—'

ওরা যে তাকে চেনে, জনকলাল বুঝতে পারছিলেন। বলে, 'তোমরা ওই ঝোপের ভেতর বসে ছিলে কেন?'

যুবকটি জানায়, তাদের গাঁয়ে আগুন লাগানো হয়েছে। দু-চারজন খুনও হয়ে গেছে। বাকি সবাই দাঙ্গাকারীদের তাড়া খেয়ে কে কোথায় পালিয়েছে কে জানে।

যুবকটি বলে যায়, 'আমরাও পালাচ্ছিলাম। লেকেন এর যা হাল—' বলে তার সঙ্গিনীকে দেখিয়ে দেয়।

তরুণীটিকে আগে ভাল করে লক্ষ করেননি জনকলাল। এবার দেখলেন তার চুল রুক্ষ, চাউনি ঘোলাটে, এক আঙুল ভেতরে ঢোকানো চোখের তলায় পুরু কালির পোঁচ, রোগা রোগা শির বার-করা হাত। এই বয়সেই গাল ভেঙে গেছে, সারা শরীর রক্তশূন্য, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

জনকলাল বুঝতে পারছিলেন, মেয়েটি দুরারোগ্য কোনও অসুখে ভুগছে। একে নিয়ে যুবকটির পক্ষে বেশি দূরে পালানো সম্ভব হয়নি, তাই ভয়ে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে ছিল।

যুবকটি এক নাগাড়ে কাতর সুরে বলে যায়, 'দুনিয়ার সব আদমি জানে পণ্ডিতজি মেহেরবান, কিরপা করে আমাদের বাঁচান।'

বিব্রত বোধ করছিলেন জনকলাল। এই ভয়ার্ত যুবক যুবতীর জন্য তাঁর পক্ষে কী করা সম্ভব, ভেবে উঠতে পারছিলেন না। খানিক চিন্তা করে বলে, 'তোমরা পুলিশের কাছে যাও—'

যুবকটি বলে, 'কাঁহা পুলিশ! কোতোয়ালি এখান থেকে কম সে কম দশ 'মিল' (মাইল)। সেখানে পৌঁছুবার আগেই হত্যারা (খুনিরা) আমাদের ধরে ফেলবে।'

মুসাফির একেবারেই চাইছিল না জনকলাল যুবকটির সঙ্গে এত কথা বলেন। ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অ্যাকসিলেরেটারে বার বার পায়ের চাপ দিচ্ছিল। ফলে গাড়িটা আরও বেশি করে কাঁপছিল, আর ইঞ্জিনটা থেকে ঘড়ঘড়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরোচ্ছিল কিন্তু স্পিড একেবারেই বাড়ছিল না।

জনকলাল দিশেহারার মতো বলে, 'তা হলে?'

যুবকটি বলে, 'ছত্তরপুরে 'কেম্প' (ক্যাম্প) বসেছে। আমাদের সেখানে যদি পৌঁছে দেন—'

জনকলালের মনে পড়ল, মাসখানেক আগে এ অঞ্চলের যে সব গাঁ দাঙ্গাবাজরা আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিয়েছিল সেখানকার লোকজনদের জন্য ছত্তরপুরে একটি রিলিফ ক্যাম্প খোলা হয়েছে। গাঁগুলোয় এখনও নতুন ঘরবাড়ি বানানো হয়নি, যতদিন না হচ্ছে ওরা সি আর পি'র পাহারায় ক্যাম্পেই থাকবে। ক্যাম্পে একবার পৌঁছুতে পারলে এই যুবক-যুবতীর আর ভয় নেই।

কিন্তু এখান থেকে মাইল দশেক এগিয়ে যে চৌরাস্তাটা পড়বে সেখান থেকে সোজা উত্তর দিকে যাবেন জনকলাল, আর ছত্তরপুর হল ওই চৌরাস্তা থেকেই খাড়া দক্ষিণে। তা ছাড়া বড় সমস্যা যেটা তা হল ছত্তরপুরে নিয়ে যেতে হলে ছেলেমেয়ে দুটোকে গাড়িতে তুলতে হয়। একই ছইয়ের তলায় ওদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে যাওয়ার কথা ভাবতেই সারা শরীর কুঁকড়ে আসে জনকলালের।

সামনের সিট থেকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নেয় মুসাফির। যদিও তার বিশ্বাস, শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ ওই যুবক-যুবতীকে পাশে বসিয়ে ছত্তরপুরে যাবার কথা চিন্তাও করবেন না, তবু চাপা গলায় সতর্ক করে দেয়, 'ওদের গাড়িতে তুলবেন না পণ্ডিতজি। এলেকা বহুৎ গরম, আমরা ফেঁসে যাব।'

জনকলাল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাঁ দিক থেকে হল্লার আওয়াজ কানে আসে। যে ঘাতকেরা খানিক আগে সেই ত্রস্ত মানুষের

দলটাকে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল, একটু ঘুরপথে মাঠের ওপর দিয়ে তারা এখন ফিরে আসছে।

যুবক এবং যুবতী দ্রুত দাঙ্গাবাজদের দিকে তাকিয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। জ্যৈষ্ঠের রোদে গাড়ির পেছনে ছুটতে ছুটতে ঘামে জামাটামা তাদের আগেই ভিজে গিয়েছিল, এখন আতঙ্কে চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। বিশেষ করে রুগ্ণ, অসুস্থ মেয়েটি আর পেরে উঠছিল না। শরীরের শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে অন্ধের মতো সে পা চালাচ্ছিল।

যুবকটি ভাঙা, রুদ্ধ গলায় বলে, 'ও লোগ লৌট আয়া। হামনিলোগ জরুর মর যায়েগা পণ্ডিতজি। কুছ কীজিয়ে—'

জনকলাল কী করবেন স্থির করতে পারেন না। ওদের গাড়িতে তুললে, দাঙ্গাবাজরা যদি দেখে ফেলে, তাঁর আর মুসাফিরের জীবন বিপন্ন হবার ষোলো আনা সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণত্বের প্রাচীন সংস্কারগুলোও ভেতর থেকে প্রবল বাধা দিচ্ছিল।

যুবকটি স্খলিত সুরে একটানা বিড় বিড় করতে থাকে, 'পণ্ডিতজি কুছ কীজিয়ে—কুছ কীজিয়ে—' তার কণ্ঠমণিটা সমানে ওঠানামা করতে থাকে।

এদিকে দাঙ্গাবাজরা অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ শঙ্কিত, সচকিত জনকলাল টের পান, তাঁর বুকের ভেতর তীব্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। নিজের অজান্তেই যেন বলেন, 'উঠে পড়। তুরন্ত—'

এর জন্যই যেন ভেতরে ভেতরে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছিল যুবকটি। ছুটতে ছুটতেই বিদ্যুৎগতিতে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে চলন্ত গাড়িতে একরকম ছুঁড়ে দিয়ে, তারপর নিজেও উঠে পড়ে।

মুসাফির ওধার থেকে বলে, 'ঠিক করলেন না পণ্ডিতজি—'

তার কথা বুঝিবা শুনতে পান না জনকলাল। তিনি লক্ষ করেছেন, ঘাতকের দলটা তাঁদের গাড়িটা দেখতে পেয়ে এদিকেই দৌড়ে আসছে।

এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়েননি জনকলাল। প্রথমটা তাঁর মাথা গুলিয়ে যায়। কিন্তু বিহ্বল ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়ে নিয়ে নিজেকে শক্ত করে নেন। গাড়িতে যখন উঠতেই দিয়েছেন, ছেলেমেয়ে দুটোকে বাঁচাতে হবে।

মোটরটা যে স্পিডে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছে, তাতে দাঙ্গাবাজরা তাঁদের ধরে ফেলবেই। যুবক আর যুবতীটি দেখামাত্র ওরা কী ঘটাবে ভাবতেই রক্ত হিম হয়ে যায় জনকলালের। ওরা যাতে হত্যাকারীদের চোখে না পড়ে সে জন্য জনকলাল বলেন, 'তোমরা ওই বস্তাগুলোর পেছনে শুয়ে পড়।' প্যাকেট থেকে দুখানা নতুন কাপড় বার করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে বলে, 'সারা গা-মাথা ঢেকে রাখবে।'

যুবক-যুবতী চাল-ডালের বস্তাগুলোর আড়ালে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হয় না, দাঙ্গাবাজরা 'রুখ যা, রুখ যা—' করে চেঁচাতে চেঁচাতে এসে গাড়িটাকে ঘিরে ফেলে। এদের অনেকেই জনকলালকে চেনে। একজন বলে, 'ও পণ্ডিতজি। ইধর কঁহা আয়া?'

জনকলাল ওদের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকেন। সবার হাতেই ছোরা, লাঠি বা বর্শা। তাঁর হৃৎপিণ্ডে যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। কোথায়, কী কারণে এসেছিলেন, জানিয়ে দিলেন।

দাঙ্গাকারীরা ছই-এর তলায় ডাঁই করে রাখা কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, তেল-ঘি'র টিন ইত্যাদি লক্ষ করছিল। তাদের চোখ চকচক করতে থাকে। বলে, 'বহুৎ মাল পেয়েছেন তো পণ্ডিতজি—'

ওদের নজরটা ভাল না। ঢোক গিলে জনকলাল বলেন, 'হাঁ, যজ্ঞের দক্ষিণা।'

'আপনি যখন যজ্ঞ করেছেন, এ সাল বারীষ নামবে, কী বলেন?'

লক্ষণ ভালই। এই শেষ কথাগুলো শুনে মনে হল, ওরা অন্তত তাঁদের অনিষ্ট করবে না। জনকলাল বলে, 'মানুষ কী করতে পারে! সব ভগোয়ানকা কৃপা।'

লোকগুলো বলে, 'ঠিক হ্যায়, যাইয়ে। তুরন্ত চলা যায়েগা। এখানকার হালচাল ভাল না।'

ভাল যে নয় এবং তার কারণ যে এই দাঙ্গাকারীরাই, সেটা আর বলা হয় না জনকলালের। এখন যতটা সম্ভব মুখ বুজে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

লোকগুলো ঘিরে ধরার পর গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল মুসাফির। ফের যখন সে স্টার্ট দিতে যাবে সেই সময় একটা লোক চেঁচিয়ে ওঠে, 'ও কে ?' বলে চালডালের বস্তাগুলোর-দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।'

এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও নতুন কাপড়ের ভেতর থেকে সেই যুবকটির একটা হাত বেরিয়ে আছে।

জনকলাল শিউরে ওঠেন। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, 'ও আমার ভাতিজা—'

'ভাতিজা তো, ওভাবে শুয়ে আছে কেন ?'

'খুব বুখার, তাই—'

আরেকটা লোক—জনকলালের যাবতীয় খবর রাখে—বলে ওঠে, 'আপনার তো ভাই নেই পণ্ডিতজি, ভাতিজা পয়দা হল কী করে ?'

জনকলালের দম বন্ধ হয়ে যায় যেন। কোনওরকমে বলেন, 'আপন ভাই না, চাচেরা ভাইয়ের ছেলে।'

লোকটার কেমন যেন খটকা লাগে। বলে, 'দেখি তো ক্যায়সা ভাতিজা—' বলে, জনকলাল বাধা দেবার আগেই যুবকটির হাত ধরে একটানে বসিয়ে দেয়। টানাটানিতে মেয়েটির গা থেকে কাপড়ের ঢাকনা সরে গিয়েছিল, তাকেও টেনে তোলে লোকটা। ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'ও ছোকরে তো আপনার ভাতিজা, এ কি তার ধরমপত্নী!'

জনকলাল উত্তর দেন না, তাঁর ঠোঁটদুটো থরথর কাঁপতে থাকে। আহাম্মক, অসতর্ক ছেলেমেয়ে দুটো নিজেদের সর্বনাশ তো করেছেই, তাঁকেও চরম বিপদের মুখে ছুঁড়ে দিল।

জনকলাল সম্পর্কে একটু আগেও লোকগুলোর যে শ্রদ্ধাভক্তিটুকু ছিল, পলকে তা উবে গাছে। তাদের চোখেমুখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলে, 'শালে পণ্ডিত, এই কুত্তাকুত্তী দুটোকে বাঁচাবার জন্যে নয়া কাপড়া চাপা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলে! তুমি না বামহন! নামিয়ে দাও ওদের—' নামাবার জন্য অপেক্ষা করে না, যুবক-যুবতীর হাত ধরে তারই টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে।

জনকলাল আকুলভাবে বলে, 'নেহা নেহি, ওদের নিয়ে যেও না।'

লোকগুলো হিংস্র গলায় চেঁচায়, 'চোপ ভুচ্চর—'

জনকলালের ভেতের থেকে কে যেন জানান দিয়ে যায়, এই ভয়ার্ত ছেলেমেয়ে দু'টিকে বাঁচাবার জন্য মনে মনে অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি। কাঁপা গলায় বলেন, 'বলেন, কী দিলে ওদের জানে মারবে না।'

দাঙ্গাকারীরা এবার একটু থতিয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে গুজ গুজ করে কী পরামর্শ করে। তারপর দুই যুবক-যুবতীর দাম জানিয়ে দেয়। নগদ দু হাজার টাকা, বিশটা নারকেল, দশ জোড়া নতুন ধুতি আর শাড়ি এবং এক বস্তা চাল।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকেন জনকলাল। সমস্ত চরাচর যেন চোখের সামনে অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যায়। তারপর পার্বতীর নিরাপত্তার জন্য যে দু হাজার টাকা জমিয়েছিলেন, ধীরে ধীরে ডান পকেট থেকে সেটা বার করে দাঙ্গাকারীদের হাতে তুলে দেন। এর মধ্যে ওরা চাল, নারকেল টারকেল নামিয়ে নিয়েছিল।

ফের গাড়ি চলতে শুরু করে। রাস্তার আর দু দল দাঙ্গাকারীর সামনে পড়ে যান জনকলালরা। তারাও দুই যুবক-যুবতীর জীবনের দাম বাবদ বাকি পাঁচ হাজার টাকা এবং দক্ষিণার অবশিষ্ট জিনিসগুলি আদায় করে নেয়।

সর্বস্ব খোয়াবার পর প্রথম দিকটায় জনকলালের মনে হয়েছিল, হাতুড়ি দিয়ে কেউ তাঁর পাঁজরের প্রতিটি হাড় ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। পরে সেই কষ্টটা হঠাৎ কমে আসে। তিনি মনস্থির করে ফেলেন, চাষের জমি বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা দিন পনেরোর ভেতর চতুরাননজিকে দিয়ে আসবেন। এই পনেরোটা দিন পার্বতীর নিরাপত্তা অনেকখানি অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। কিন্তু কী আর করা যাবে! নিজের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, ছেলেমেয়ে দুটোকে বাঁচাবেন। জীবনে কখনও সংকল্পের নড়চড় হয়নি তাঁর।

সন্ধের আগে আগে চৌরাস্তায় পৌঁছে যান জনকলালেরা।

এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি মুসাফির। এ বার তীব্র কটু গলায় বলে, 'সব টাকাপয়সা তো দিয়ে দিলেন। পার্বতী বহিনের যে সর্বনাশ হয়ে গেল!'

জনকলাল বলে, 'কোনও সর্বনাশ হয়নি। মেয়েটা আর ক'দিন বেশি কষ্ট ভোগ করবে, এই আর কী। চতুরাননজির টাকা আমি খুব তাড়াতাড়িই দিয়ে আসব।'

'লেকেন—'

'কী?'

'টাকা পাবেন কোথায়?'

রুক্ষ স্বরে জনকলাল বলে, 'সে তোকে ভাবতে হবে না।'

এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস করে না মুসাফির। গাড়ির মুখটা নহরপুরার দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

জনকলাল চমকে ওঠেন, 'এ কী, ওদিকে যাচ্ছিস যে!'

'পার্বতী বহিনের শ্বশুরজিকে বলে আসবেন, টাকাটা কবে দিতে পারবেন।' মুসাফির বলে, 'নইলে—'

'নেহি, আগে ছত্তরপুর চল—'

কী বলছেন আপনি! পার্বতী বহিন আপনার লেড়কি—'

গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠেন জনকলাল, 'যা বলছি তাই কর—'

পণ্ডিতজির এমন চেহারা আগে আর কখনও দেখেনি মুসাফির, ভয়ে ভয়ে সে গাড়িটা আবার ঘুরিয়ে নেয়। ছত্তরপুরায় যাওয়াটা কেন বেশি জরুরি সেটা সে বুঝে উঠতে পারছে না।

---

# জনক

শীতের দুপুরে সূর্য যখন সোজা মাথার ওপর উঠে আসে সেই সময় দোতলার পশ্চিম দিকের লম্বা বারান্দায় লাল গালিচার ওপর বিছানা পেতে তার এক পাশে চশমার খাপ, রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী আর দু'খানা বাংলা খবরের কাগজ যত্ন করে সাজিয়ে রেখে আসে শোভনা। ততক্ষণে দুপুরের খাওয়া শেষ হয়ে যায় শেখরনাথের। আঁচিয়ে, তোয়ালেতে মুখ মুছে আশি বছরের জীর্ণ, নড়বড়ে শরীর টানতে টানতে বারান্দায় চলে যান তিনি। শোভনা তাঁর পুত্রবধু।

দুপুরে ধর্মগ্রন্থ আর খবরের কাগজ পড়াটা শেখরনাথের বহুকালের প্রিয় অভ্যাস। কিন্তু ইদানীং ক'বছর আর্থারাইটিসে ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছেন। দুই কাঁধে এবং কোমরে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। তখন মনে হয় কেউ যেন তাতানো লোহার ফলা শরীরের ঐ অংশগুলোতে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কড়া ডোজের ওষুধ আর ফিজিওথেরাপিতেও বিশেষ কাজ হচ্ছে না। আজকাল পেটে দুপুরের ভাতটি পড়লেই দু'চোখ জড়িয়ে আসে। বই বা কাগজ-টাগজ আর পড়া হয়ে ওঠে না, সে সব নাড়াচাড়া করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েন।

দোতলার এই বারান্দাটা এমনভাবে টানা যে প্রথম দিকে দুপুরের রোদ একটু কোণাকুণি শেখরনাথের পায়ের ওপর স্থির হয়ে থাকে। আকাশের ঢাল বেয়ে সূর্য যত পশ্চিমে নামে, রোদ ক্রমশ তাঁর সারা গায়ে ছড়িয়ে যায়। রোদের টনিকটা তাঁর খুব দরকার।

অন্য দিনের মতো আজও শোওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শেখরনাথ। যখন জেগে উঠলেন, বিকেল হয়ে গেছে। পশ্চিমের উঁচু উঁচু বাড়ি আর গাছপালার আড়ালে সূর্য ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

ঘুম ভাঙলেও শুয়েই রইলেন শেখরনাথ, মখমলের খাপ থেকে বাইফোকাল লেন্সের গোল চশমাটা বার করে চোখে পরে নেন। তাঁর সমস্ত শরীর এখন বেলাশেষের অনুজ্জ্বল সোনালি রোদের আরকে ডুবে আছে। শেখরনাথ জানেন কিছুক্ষণের মধ্যেই শোভনা স্যাকারিন-দেওয়া

এক কাপ চা নিয়ে আসবে, সেটি শেষ হতে না হতেই দিনের শেষ আলোটুকু আর থাকবে না। হালকা পায়ে নেমে আসবে শীতের সন্ধে, তাপমাত্রা ঝপ্‌ করে নেমে আসবে কয়েক ডিগ্রি। তখন আর এক মুহূর্তও এই খোলা বারান্দায় শ্বশুরকে থাকতে দেবে না শোভনা, তাড়া দিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে যাবে। তার জন্যই অপেক্ষা করছেন শেখরনাথ।

আজ রবিবার।

বারান্দার ও-মাথায় একঝাঁক শালিক চঞ্চল পায়ে নাচানাচি করছে আর মাঝে মাঝেই হঠাৎ খুশিতে কিচিরমিচির করে উঠছে। একতলায় চলছে তুমুল হইচই। তার মানে সন্দীপ, শোভনা, রাজা আর রুকু টেবল টেনিস কি ক্যারম নিয়ে মেতে উঠেছে।

সন্দীপ শেখরনাথের একমাত্র ছেলে, একটা নাম-করা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির একজিকিউটিভ। রাজা আর রুকু তাঁর নাতি-নাতনী। রাজা সেণ্ট জেভিয়ার্সে ইংলিশ অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। রুকুর এবার ক্লাস ইলেভেন, সে পড়ে ক্যালকাটা গার্লসে। ছেলেমেয়ের সঙ্গে শোভনার সম্পর্ক বন্ধুর মতো, কোথাও যাবার না থাকলে ছুটির দিনগুলো আড্ডা দিয়ে, ভিসিয়ার-এ ভালো ছবি দেখে কি ক্যারম-ট্যারম খেলে ওরা কাটিয়ে দেয়। শালিকদের চেঁচামেচি কি নিচের তলার চিৎকার ছাড়া এখন আর কোথাও কোনও শব্দ নেই।

বাড়ির সামনে দিয়ে তিরিশ ফুট চওড়া অভয় হালদার রোড সোজা ট্রাম রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। তার ওধারে একটা মাঝারি পার্ক। শেখরনাথদের এদিকটায় বেশির ভাগ বাড়িই একতলা কি দোতলা, ক্বচিৎ দু-চারটে তেতলা। কিন্তু পার্কের ওদিকে হাই-রাইজের ছড়াছড়ি।

অভয় হালদার রোডে লোকজন বিশেষ নেই। বড় রাস্তায় দু-একটা ট্রাম, মিনি বাস কি ট্রাক গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের যেন কোথাও যাবার তাড়া নেই—সব কিছুই গন্তব্যহীন, ঢিলেঢালা, আলস্য মাখানো। দূরের পার্কটায় নানা রঙের পোশাক-পরা অসংখ্য বাচ্চা ছোটাছুটি করছে, ওদের সঙ্গে রয়েছে মা কিংবা আয়ার দল। ইস্টম্যান কালারে তোলা নির্বাক সিনেমার একটি দৃশ্য যেন।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় উঠে বসেন শেখরনাথ। গা থেকে কম্বলটা খসে পড়ে, আস্তে আস্তে সেটা তুলে যখন ফের ভাল করে জড়িয়ে নিচ্ছেন সেই সময় চোখে পড়ে ট্রাম রাস্তার মুখে এসে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গেল আর তার ভেতর থেকে মধ্যবয়সী একটি মহিলা নেমে রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে এদিকেই এগিয়ে আসছে। খুব সম্ভব কারও ঠিকানা খুঁজছে। ট্যাক্সিটা কিন্তু মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়েই থাকে। আশি বছরের নির্জীব চোখেও শেখরনাথ আবছাভাবে দেখতে পান, ড্রাইভার ছাড়াও ট্যাক্সিটায় আরেকজন বসে আছে।

মহিলাটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত চেহারা। চিবুকের তলায়, গালে এবং কোমরে বেশ মেদ জমেছে কিন্তু সৌন্দর্যের শেষ রশ্মিগুলি এখনও তাঁর চোখমুখ থেকে একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি। পরনে কাঁথা স্টিচের দামি শাড়ি, চোখে ফ্যাশনেবল চশমা, ডান কাঁধ থেকে চমৎকার লেডিজ ব্যাগ ঝুলছে, বাঁ হাতে বড় একটা সুটকেশ।

কৌতূহলশূন্য চোখে লক্ষ করছিলেন শেখরনাথ। মহিলাটি বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে যখন তাঁদের 'শান্তি নিবাস'-এর সামনে এসে দাঁড়ায় তখন চমকে ওঠেন। শরীর ভারি হয়ে গেলেও তিরিশ বছর আগের এক মেদহীন প্রাণবন্ত তরুণীর আদল যেন মহিলার সর্বাঙ্গে বসানো। সেই ডিম্বাকৃতি নিষ্পাপ মুখ, ঘন পালকে-ঘেরা উজ্জ্বল চোখ, তেমনই চিবুকের খাঁজ, মসৃণ ভাঁজহীন গলা। মনে মনে বিড় বিড় করেন শেখরনাথ, 'হে ঈশ্বর, এ যেন সে না হয়।'

দোতলার বারান্দার ঠিক তলায় সদর দরজা। মহিলা সেখানে গেলে ওপর থেকে তাকে আর দেখা যায় না। তবে সে যে কলিং বেল টিপেছে তার সুরেলা আওয়াজ গোটা বাড়িটায় ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার শব্দ শুনতে পান শেখরনাথ। টের পাওয়া যায়, সন্দীপরা সবাই হুড়মুড় করে আগন্তুককে দেখার জন্য দৌড়ে গেছে।

শেখরনাথ স্নায়ুমণ্ডলীকে টান টান করে বসে থাকেন। একসময় মহিলার গলা আবছাভাবে শোনা যায়, 'এটা কি শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি?'

কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন শেখরনাথ। তিরিশ বছর আগে ছিল সেতারের ঝঙ্কারের মতো সতেজ, এতকাল বাদে কিছুটা মোটা আর খসখসে হয়ে গেলেও আগের অনেকটাই এখনও থেকে গেছে।

সন্দীপ বলে, 'হ্যাঁ। আপনি কাকে চাইছেন?'

'আমি—আমি ঢাকা থেকে আসছি। ভেতরে বসে কথা বলা যেতে পারে কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আসুন।'

এরপর দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আগন্তুক বলছিল ঢাকা থেকে আসছে। তার মানে সে—নিশ্চয়ই সে। এই শীতের বিকেলে অঢেল বাতাস চারদিকে, তবু মনে হল দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ফুসফুস যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ওদিকে হইচই মাতামাতি থেমে গিয়ে নিচের তলাটা একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে।

কী করবেন, প্রথমটা স্থির করতে পারলেন না শেখরনাথ। ব্যাকুল, বিহ্বল দৃষ্টিতে শীতের এই মলিন বেলাশেষে ম্রিয়মাণ রাস্তাঘাট বাড়িঘরের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মনস্থির করে ফেলেন। একটু পরে শোভনা কি সন্দীপ, কিংবা দু'জনেই দোতলায় ছুটে আসবে কিন্তু ঢাকা থেকে এইমাত্র যে এসেছে তিনি তার মুখ দেখতে চান না। এতকাল তাঁদের ধারণা ছিল সে মৃত। কিন্তু না, এখনও বেঁচে আছে, অথচ বছরের পর বছর তার মৃত্যুকামনা করতে করতে কবে যেন তাকে ভুলে গিয়েছিলেন। কী প্রয়োজন তিরিশ বছর পর কলকাতায় এসে তাঁর বুকের গভীরে লুকনো একটি ক্ষতকে ঘা দিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত করে তোলার?

বিকল শরীরটাকে এক টানে টেনে তোলেন শেখরনাথ। যন্ত্রণার একটি প্রবাহ কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত তীব্র গতিতে নেমে যায়। অন্য সময় হলে তাঁর গলা দিয়ে কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসত। এখন কিন্তু তেমন কোনও অনুভূতিই হলো না।

বারান্দার বাঁ পাশে তাঁর নিজস্ব ঘর। সেটায় দুটো দরজা। একটা দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়া যায়, আরেকটা এই বারান্দায় যাতায়াতের জন্য। ধড়ফড় করে ঘরে ঢুকে দুটো দরজাই বন্ধ করে দিলেন শেখরনাথ।

এখানে আসবাব বলতে খুব সামান্যই। এক ধারে দেওয়াল ঘেঁষে পুরনো আমলের খাটে পুরু জাজিমের ওপর ধবধবে বিছানা। আরেক পাশে কাঠের ছোট সিংহাসনে কালী থেকে গণেশ পর্যন্ত নানা দেবদেবীর মূর্তি। এ ছাড়া আছে আলনা, আলমারি, দু-একটা সেকেলে লোহার ট্রাঙ্ক। এক দেওয়ালে লক্ষ্মীর ছবিওলা বাংলা ক্যালেণ্ডার এবং তার ওপর ফ্রেমে-বাঁধানো পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছরের এক মধ্যবয়সিনীর ফোটো। হাস্যোজ্জ্বল, সুন্দর এই মানুষটি হেমলতা—শেখরনাথের স্ত্রী। তেষট্টিতে যেবার তিনি মীরপুরে পুড়ে মারা যান সে বছরই ছবিটা তোলা হয়েছিল, এটাই হেমলতার শেষ ছবি।

দুই দরজায় খিল তুলতেই কেউ যেন ধাক্কা দিতে দিতে শেখরনাথকে বিছানায় তুলে দেয়। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে তিনি স্ত্রীর ফোটোর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকেন।

বহুবার শেখরনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন, পেছন ফিরে তাকাবেন না। তিরিশ বছর আগে যা ঘটেছে, তার জন্য ভেতরে বাইরে ভেঙেচুরে তিনি শতখান হয়ে গেছেন। হৃৎপিণ্ডে কত যে রক্তক্ষরণ হয়েছে তার খবর কে রাখে? সন্দীপ তখন পনের বছরের কিশোর তার মুখের দিকে তাকিয়ে শোক, দুঃখ, কাতরতা ভুলতে চেষ্টা করেছেন শেখরনাথ।

সময়ের হাতে এমন এক ম্যাজিক থাকে যা সমস্ত কিছুর তীব্রতা কমিয়ে দেয়, দিয়েও ছিল। শেখরনাথের মনে হয়েছিল সব ভুলে গেছেন কিন্তু তিরিশ বছরের পলির স্তর সরিয়ে উঠে আসছে সেই দিনগুলো—ভীতিকর, আতঙ্কজনক, দুঃস্বপ্নে-ভরা। বিস্মৃতিতে যা লুপ্ত হয়ে গেছে মনে হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তার কিছুই হারায় নি, স্মৃতির কালাধারে অবিকল সংরক্ষিত আছে।

মনে পড়ে, দেশভাগের পর সেই আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যখন শরণার্থীর ঢল নামল পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বা আসামের দিকে, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন হেমলতা। শেখরনাথকে বলেছিলেন 'চল, বাড়ি বেচে কলকাতায় চলে যাই।' সে সময় ইস্ট পাকিস্তানে জমিজমা বাড়িঘর বিক্রির তেমন সমস্যা ছিল না।

শেখরনাথ তখন ম্যাকেঞ্জি ব্রাদার্সের জুটমিলে জুনিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। ঢাকা থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে

ধলেশ্বরীর পাড়ে মীরপুরে ছিল চটকলটা। দেড়শ' বছর ধরে শেখরনাথরা ঐ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। বংশলতিকার দিক থেকে তাঁদের সপ্তম প্রজন্ম চলছিল। এর মধ্যে তাঁদের কেউ কোনওদিন অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবেন নি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের শিকড় এই পুরনো শহরটির মাটির তলায় বহুদূর ছড়িয়ে গেছে। এক কথায় তা উপড়ে ফেলা সহজ ছিল না। শেখরনাথ বলেছেন, 'কলকাতায় যাব কেন? আমরা কি কোনও অপরাধ করেছি? এটা আমার দেশ, এখানেই থাকব।'

'কিন্তু দেখছ না, রোজ কত লোক চলে যাচ্ছে—'

'যাক, আমরা যাচ্ছি না।'

হেমলতা উদ্বিগ্ন মুখে বলেছেন, 'আমার মন বলছে, শেষ পর্যন্ত এদেশে থাকতে পারব না।'

শেখরনাথ ছিলেন প্রচণ্ড গোঁড়া, ব্রাহ্মণত্বের যাবতীয় সংস্কারকে তিনি প্রায় ধর্মপালনের মতো আগলে আগলে রাখতেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের অন্য একটি দিক ছিল, প্রতিবেশীদের তিনি বিশ্বাস করতেন, তাদের ওপর ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলেছেন, 'এই শহরের সবাই আমাদের চেনে। তারা থাকতে কেউ আমাদের গায়ে একটা আঁচড় কাটতে পারবে না।'

হেমলতা উত্তর দেন নি।

শেখরনাথ ফের বলেছেন, 'মীরপুরে কম রায়ট হয় নি কিন্তু আমাদের কি কোনও ক্ষতি হয়েছে? লোকজন বিপদের সময় ছুটে আসে নি?'

তাঁদের প্রতিবেশীরা ছিল সহৃদয়, সহানুভূতিশীল। ঘোর দুঃসময়ে তারা চিরকাল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় যখন অখণ্ড ভারত জুড়ে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তখনও তারা শেখরনাথদের গায়ে কাউকে একটা আঙুল ঠেকাতে দেয়নি। সবই ঠিক, তবু স্বামীর মতো মানুষের ওপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না হেমলতা। দেশভাগের পর তাঁর বিশ্বাসের ভিতটাই আলগা হয়ে গিয়েছিল। তিনি অবশ্য শহরের মানুষ সম্পর্কে নিজের সংশয়ের কথাটা পরিষ্কার করে সেদিন কিছু বলেন নি। শুধু শঙ্কাতুর সুরে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কিন্তু খুকু? তার ভবিষ্যৎ কী?' তখন তাঁদের একটি সন্তানেরই শুধু জন্ম হয়েছে যার আদরের নাম

খুকু। অন্য একটি নামও রাখা হয়েছিল—মণিকা, যা পরে স্কুল-কলেজে ব্যবহার করা হবে। তখন খুকুর বয়স ছিল পাঁচ।

হেমলতার প্রশ্নের ভেতর পরিস্কার একটা ইঙ্গিত ছিল যা বুঝতে অসুবিধে হয় নি শেখরনাথের। তাঁর স্ত্রীটি তাঁদের মতোই বরিশালের এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে, বাপের বাড়ির যাবতীয় প্রাচীন সংস্কার এবং রক্ষণশীলতা অস্থিমজ্জায় পুরে তিনি শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন, তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের গোঁড়ামি। হেমলতার ভাবনাচিন্তা ধ্যানধারণা সব কিছুই শক্ত লোহার ফ্রেমে আটকানো, এই ফ্রেমটির বাইরে একটি পা ফেলাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মনে মনে কিন্তু একটু কৌতুকই বোধ করেছিলেন শেখরনাথ। বলেছেন, 'পাঁচ বছরের একটা ছোট্ট মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে ফেলছ!'

'ভাবতাম না, যদি দেশটা আগের দেশ থাকত। তা ছাড়া খুকুর বয়েস চিরদিন পাঁচ বছর থাকবে না।'

'তোমার কি ধারণা এখানকার সবাই অমানুষ হয়ে গেছে?'

'হয়ত হয়নি। কিন্তু খুকুর—'

'বিয়ের কথা বলতে চাইছ তো?'

কিচ্ছু না বলে সোজা স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন হেমলতা।

শেখরনাথ বলেছেন, 'দেশে ভাঙন ধরলেও সবাই বাড়িঘর ফেলে ওপারে চলে যাবে না। যারা থাকবে তাদের ভেতর থেকে খুকুর জন্যে তোমার মনের মতো একটি ছেলে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।'

...হঠাৎ ভেতর দিকের বন্ধ দরজায় আস্তে আস্তে টোকা পড়ে, সেই সঙ্গে শোভনার চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'বাবা—বাবা—'

স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে আসেন শেখরনাথ। কিন্তু সাড়া দিতে গিয়েও থমকে যান। শোভনা কেন এসেছে, তিনি জানেন।

আরও কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে শোভনা চলে যায়। একটু পরেই আরও একজোড়া চেনা পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে ব্যস্তভাবে দরজার সামনে এসে থামে। সন্দীপ, যার ডাকনাম লালু—এবার সে এসেছে।

সন্দীপ ডাকে, 'বাবা, দরজা খোল—' তার গলা উত্তেজনা এবং অস্থিরতায় কাঁপছে।

শেখরনাথ চুপ, আচ্ছন্নের মতো বসে থাকেন।

সন্দীপ একটানা বলে যায়, 'দরজা খোল—দরজা খোল। ঢাকা থেকে দিদি এসেছে।'

শেখরনাথের হৃৎপিণ্ড পলকের জন্য থেমে এমন প্রবল গতিতে লাফাতে থাকে যে তার উত্থানপতনের শব্দ তিনি নিজেই যেন শুনতে পান। মনে হয় বুকের ভেতর কেউ এলোপাথাড়ি হাজারটা ঢাক পিটিয়ে চলেছে।

ব্যাকুলভাবে সন্দীপ এবার বলতে থাকে, 'বাবা, তুমি কি দিদির সঙ্গে দেখা করবে না? ও কি চলে যাবে?'

শেখরনাথ বসেই থাকেন। হতাশ, ব্যর্থ, বিপর্যস্ত সন্দীপ ডেকে ডেকে একসময় নিচে নেমে যায়।

স্বয়ংক্রিয় কোন নিয়মে ধলেশ্বরীপারের সেই সব দিন আবার স্মৃতিতে হানা দেয় শেখরনাথের।

...সেই যে খুকুকে নিয়ে হেমলতার সঙ্গে কথা হয়েছিল তারপর মীরপুরের আবহাওয়া দ্রুত বদলে যেতে থাকে। ওপার থেকে জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতো শরণার্থীরা যেমন ইণ্ডিয়ায় চলে এসেছিল তেমনি বিহার উত্তরপ্রদেশ থেকেও অজস্র মানুষ উৎখাত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম কি খুলনার মতো বড় বড় শহর ভরে যাবার পর তাদের অনেকেই চলে এসেছিল মীরপুরে। পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের মতো এদের মনেও ছিল সর্বস্ব হারানোর জন্য ক্রোধ, হতাশা আর তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা। মীরপুরের নতুন আগন্তুকদের শক্ত চোয়ালে সবসময় নিষ্ঠুরতা ফুটে থাকত, দু'চোখে আগুন জ্বলত।

দ্বিজাতিতত্ত্বের মধ্যে যে প্রচণ্ড ঘৃণা আর অবিশ্বাস ছিল, দেশভাগের পরও তার বিষ এতটুকু কমেনি, বরং ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। ভারত আর পাকিস্তানের সম্পর্ক এমনই জটিল আর স্পর্শকাতর যে কোথাও পান থেকে সামান্য চুনটুকু খসলে সীমান্তের দু'ধারেই তুলকালাম ঘটে যেত। বাতাসে তখন বিদ্বেষের বারুদ, একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে পড়ার শুধু অপেক্ষা।

যত দিন যাচ্ছিল, মীরপুরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। মাঝে মাঝে ছোটখাট দাঙ্গাও হচ্ছিল। তবে আগের মতোই প্রতিবেশীরা শেখরনাথদের আগলে আগলে রেখেছে।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেল। এর মধ্যে ম্যাকেঞ্জি ব্রাদার্সের ব্রিটিশ মালিক ঢাকার এক ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কাছে চটকল বেচে দিয়ে দেশে চলে গেলেন। কারখানার পরিবেশও আগের মতো রইল না। শেখরনাথ বুঝতে পারছিলেন এখানে তিনি অবাঞ্ছিত। হেমলতার সঙ্গে এ নিয়ে বহু আলোচনাও হয়েছে। এদিকে খুকু বড় হচ্ছিল। তাঁদের আরও দুটি ছেলেও হয়েছে—সন্দীপ আর সঞ্জয়।

শুধু কারখানাতেই নয়, যে প্রতিবেশীরা ছিল তাঁদের আশাভরসা তাদের কারো কারো আচরণ, চোখমুখের চেহারা বদলে যাচ্ছিল। দেশভাগের পরও মানুষের প্রতি শেখরনাথের যে অগাধ বিশ্বাস ছিল তাতে চিড় ধরতে শুরু করেছিল। একবার ভাবছিলেন কলকাতায় চলে যাবেন, পরক্ষণে মনে হচ্ছিল দেখাই যাক না আর ক'টা দিন। আসলে কলকাতা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ অচেনা। সেখানে গিয়ে কি করবেন, কোথায় থাকবেন, ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে কিভাবে বাঁচাবেন, ভেবে উঠতে পারছিলেন না। ঘোর অনিশ্চয়তা তাঁকে স্থির কোনও সিদ্ধান্ত নিতে দিচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত আচমকা আবার দাঙ্গা বাধল মীরপুরে। পুরনো প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল তারা দৌড়ে আসার আগেই বাড়িতে আগুন লাগানো হল, পুড়ে মারা গেলেন হেমলতা, লুট হয়ে গেল খুকু। সন্দীপ আর সঞ্জয় তখন স্কুলে, শেখরনাথ তাঁর জুট মিলে, তাই তাঁরা প্রাণে বেঁচে গেলেন।

এরপর শেখরনাথ ঠিক করে ফেললেন, এদেশে আর থাকবেন না। হিতাকাঙ্ক্ষীরা বললে, 'কলকাতায় চলে যান। এখানকার যা হাল, না থাকাই ভাল।' তারাই বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করে দিল। যা দাম হওয়া উচিত তার আট ভাগের একভাগ মাত্র পাওয়া গেল।

কলকাতায় আসার পর এপারের আত্মীয়স্বজনরা, যারা পার্টিশানের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছেড়েছিল—অভয় হালদার রোডের এই বাড়িটা কিনে দেয়। ভাল একটি স্কুলে ভর্তি হল সন্দীপ আর সঞ্জয়। শেখরনাথ এখানকার

এক মার্কেণ্টাইল ফার্মে ছোটখাট একটা কাজও জোগাড় করলেন। সঞ্জয় কিন্তু বেশিদিন বাঁচে নি, কলকাতায় আসার বছরখানেকের মধ্যে ভুল চিকিৎসায় মারা যায়।

সর্বস্ব খোয়াবার পর সন্দীপকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন শেখরনাথ। এই ছেলেই তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সন্দীপও খুব শান্ত, বাধ্য, বাবা ছাড়া কিছুই জানত না। ছাত্র হিসেবেও অসাধারণ, মেধাবী। এম কম-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে কোম্পানি সেক্রেটারিশিপে ডিগ্রি নেবার পর মাল্টিন্যাশনাল ফার্মে চাকরি পেল। তারপর ওর বিয়ে দিলেন শেখরনাথ।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বুকের ভেতর দুটো দগদগে রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে শেখরনাথ কলকাতায় এসেছিলেন—হেমলতা আর খুকু। হেমলতা তো খুনই হয়েছেন। কিন্তু খুকু? প্রতিদিন তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, খুকুরও যেন মৃত্যু হয়। ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনা শোনেন নি।

কখন সন্ধে নেমে গিয়েছিল, শেখরনাথ জানেন না। শীতের অন্ধকার আর হিমে বাইরের রাস্তায় কর্পোরেশনের আলোগুলোর তলায় কুয়াশার ছোট ছোট বৃত্ত চোখে পড়ে।

শেখরনাথ বিছানা থেকে নেমে যে ঘরের আলোটা জ্বালবেন, তেমন কোনও ইচ্ছাই নিজের মধ্যে খুঁজে পেলেন না। ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া যে খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে, সেদিকেও তাঁর খেয়াল নেই। আচ্ছন্নের মতো, অনুভূতিশূন্যের মতো তিনি বসেই থাকেন।

কতক্ষণ পর মনে নেই, আবার সিঁড়িতে পরিচিত চার জোড়া পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। এবার আর সন্দীপ বা শোভনা একা একা আসে নি। রাজা আর রুকুও ওদের সঙ্গে এসেছে।

ফের দরজায় ধাক্কা পড়ে। ওরা একসঙ্গে ডাকতে থাকে, 'বাবা—বাবা— দাদু—দাদু'

কিছুক্ষণ আগের মতোই সাড়া না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন শেখরনাথ।

এবার অন্য সবার গলা ছাপিয়ে সন্দীপের কণ্ঠস্বর কানে আসে, 'তোমার ভয় নেই, দিদি চলে গেছে। ওর মুখ তোমাকে দেখতে হবে না। দরজা খোল—' তার গলায় ক্ষোভ, দুঃখ, হয়তবা কিছুটা অধীরতাও মেশানো।

আশ্চর্য! যাকে তিনি দেখতে চাননি, যার জন্য তিরিশ বছর তাঁর কাছে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু কাম্য ছিল না, সে চলে গেছে শুনে অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা বোধ করতে থাকেন শেখরনাথ। নিজেকে টেনে-হেঁচড়ে খাট থেকে নামিয়ে আনেন, আলো জ্বেলে দরজা খুলে দেন।

কিছুক্ষণ স্থির চোখে শেখরনাথকে লক্ষ করে সন্দীপরা। তারপর একসঙ্গে সবাই ঘরে ঢোকে।

শেখরনাথের পরনে ধুতি আর হাফ-হাতা খদ্দরের জামা ছাড়া আর কিছু নেই। রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে হু হু করে উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে হিম ঢুকছে। ঠাণ্ডায় তাঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে কিন্তু তিনি বুঝি টের পাচ্ছেন না। শোভনা ছুটে ঘরের এক কোণের আলনা থেকে শাল এনে শ্বশুরের গায়ে ঘন করে জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে ধরে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেয়।

সন্দীপ, রুকু আর রাজা শেখরনাথের কাছে এগিয়ে এসেছিল, তবে তারা বসে না।

সন্দীপ বলে, 'এ তুমি কী করলে বাবা! দিদিরা কত বছর ধরে আমাদের খোঁজ করেছে। শেষ পর্যন্ত ঢাকার ইণ্ডিয়ান হাই কমিশন এ বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে দিতে পেরেছে আর সেটা পেয়েই ওরা ছুটে এসেছিল, কিন্তু তুমি দরজায় খিল দিয়ে বসে রইলে, একবারও দিদিকে কাছে ডেকে নিলে না! দিদি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। আর কোনওদিনই সে আসবে না।' একটু থেমে আবার বলে, 'হারুণদা কী ভাবল বল তো?'

রুদ্ধস্বরে শেখরনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কে হারুণদা?'

'দিদির স্বামী।'

সন্দীপের কথা শেষ হতে না হতেই শেখরনাথের মুখচোখের চেহারা একেবারে বদলে যায়। তাঁকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখায়। মনে হয় তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। হারুণ নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণত্বের প্রাচীন সংস্কারগুলি শেখরনাথকে বিপর্যস্ত করে তুলতে থাকে। ভাঙা, আবছা গলায় তিনি বিড়বিড় করেন, 'স্বামী—খুকুর স্বামী!'

সন্দীপ বাবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। বরাবরই সে ধীর, স্থির, ধৈর্যশীল। কিন্তু এখন তাকে কিছুটা উত্তেজিত দেখায়, 'জানো, হারুণদা দিদির জন্যে কী করেছেন! তিনি হাত না বাড়িয়ে দিলে দিদি আজ কোথায় তলিয়ে যেত!' এরপর একটানা সে যা বলে যা তা এইরকম। তেষট্টিতে মীরপুরের সেই রায়টের পর দাঙ্গাবাজরা যখন খুকুকে লুট করে নিয়ে যায় সেইসময় ঐ অঞ্চলের সাব ডিভিসানাল অফিসার ছিলেন হারুণ। তিনিই কয়েক মাস বাদে খুকুকে উদ্ধার করে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যান। তারপর তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য শেখরনাথদের খোঁজ করতে থাকেন। কিন্তু ততদিনে তাঁরা কলকাতায় চলে এসেছেন।

বছরখানেক চেষ্টার পরও যখন শেখরনাথদের সন্ধান পাওয়া যায় না তখন লাঞ্ছিতা একটি মেয়েকে সামাজিক মর্যাদা দেবার জন্য বিয়ে করেন। তাঁর মা-বাবার দিক থেকে কোনওরকম বাধা আসেনি, বরং তাঁরা পরম উদারতায় খুকুকে গ্রহণ করেছিলেন।

সেদিনের সেই তরুণ অফিসার হারুণ এখন ঢাকায় এডুকেশন মিনিস্ট্রির জয়েন্ট সেক্রেটারি। ওঁদের এক ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলে ডাক্তার, মেয়েরা কলেজে পড়ছে।

সন্দীপ বলে, 'তুমি হয়তো বলবে, দিদির আত্মহত্যা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি বলব, হারুণদাকে বিয়ে করে সে ঠিক করেছে। এর চেয়ে সম্মানজনক আর কিছু হতে পারে না।'

শেখরনাথ চমকে ওঠেন। গোঁড়া, রক্ষণশীল বাপ-মায়ের ছেলে হয়ে এসব কী বলছে সন্দীপ! বিমূঢ়ের মতো তিনি তাকিয়ে থাকেন।

সন্দীপের ওপর কিছু একটা ভর করেছিল যেন। নিজের ঝোঁকে সে বলে যায়, 'আমাদের কমিউনিটির এমন একটি ছেলে কি তুমি দিদির জন্যে জোগাড় করতে পারতে? কক্ষণো নয়। দে আর হ্যাপি, এক্সট্রিমলি হ্যাপি।'

কিছু একটা বলতে চাইলেন শেখরনাথ কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না।

সন্দীপ বলে যায়, 'ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল বাবা, দিদি আর কোনওদিন আমাদের এখানে আসবে না।'

শেখরনাথ চুপ করে থাকেন।

সন্দীপ এবার বলে, 'হারুণদাও এসেছিলেন। মেয়ে বাপের বাড়িতে কিরকম অভ্যর্থনা পায় সেটা বুঝে বাড়িতে ঢুকতেন। তা আর হল না।'

ছেলের কথায় শ্লেষ ছিল। সেদিকে লক্ষ নেই শেখরনাথের। জোরে শ্বাসটানার মতো শব্দ করে বলেন, 'এসেছিল!'

'হ্যাঁ। ট্রাম রাস্তায় ট্যাক্সিতে বসে ছিলেন।'

শেখরনাথের মনে পড়ে, বিকেলে খুকু যে ট্যাক্সি থেকে নামে তার ভেতর একজনকে বসে থাকতে দেখেছেন। সে-ই তা হলে হারুণ!

আরও খানিকক্ষণ বাদে সন্দীপরা চলে যায়। সাড়ে আটটা বাজলে শোভনা শেখরনাথের জন্য রাতের খাবার নিয়ে আসে—দু'খানা সুজির রুটি, আলু-কপির তরকারি, এক বাটি দুধ আর একটি সন্দেশ। শ্বশুরকে খাইয়ে, তাঁর বিছানা করে শুইয়ে দিয়ে, চারপাশে নেটের মশারি গুঁজে চলে যায়।

অন্যদিন শোবার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ জুড়ে আসে কিন্তু আজ ঘুম আসছে না। বার বার খুকুর মুখটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর মশারি সরিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অস্থির পায়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। টের পান, বুকের ভেতর অনবরত কিসের যেন ভাঙচুর চলছে।

সারারাত নিদ্রাহীন কাটিয়ে ভোরবেলায় শেখরনাথ মনস্থির করে ফেলেন। তাঁর ঘরের সঙ্গে যে বাথরুমটি রয়েছে সেখানে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে দোতলার শেষ মাথায় রাজার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করার পর ঘুম ভাঙে রাজার। দরজা খুলে অবাক হয়ে যায় সে। বলে, 'দাদু তুমি! কী হয়েছে?'

শেখরনাথ বলেন, 'কিছু না। তোর পিসি কলকাতায় কোথায় উঠেছে রে?'

'পার্ক স্ট্রিটের একটা হোটেলে।'

'তুই আমাকে এখনই নিয়ে যেতে পারবি?'

নিজের কানে শোনার পরও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না রাজার। বিভ্রান্তের মতো সে বলে, 'তুমি যাবে!'

শেখরনাথ আস্তে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু গেলে তো দেখা হবে না।'

'কেন ?'

'আজ সকালের ফ্লাইটে ওরা ঢাকায় যাচ্ছে। আমরা যেতে যেতে পিসিরা বেরিয়ে পড়বে।'

একটু ভেবে শেখরনাথ বলেন, 'তা হলে তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নে। আমরা এয়ারপোর্টেই যাব। কাউকে এখন এ কথা বলার দরকার নেই।'

নিজের ঘরে ফিরে এসে দ্রুত পোশাক পালটে নেন শেখরনাথ। এক ধারে ছোট একটা লোহার সিন্দুক আছে, সেটা খুলে তার ভেতর থেকে মাঝারি একটা চামড়ার ব্যাগ বার করে সিন্দুকটা ফের বন্ধ করে দেন।

আরও কিছুক্ষণ পর রাজাকে সঙ্গে নিয়ে শেখরনাথ যখন চুপিসারে বেরিয়ে পড়েন তখনও এ বাড়ির কারও ঘুম ভাঙে নি।

শীতের এই ভোরে চারপাশের বাড়িঘর, ট্রামরাস্তা, দূরের পার্ক—সব কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে। কর্পোরেশনের বাতিগুলো এখনও কেউ নিভিয়ে দিয়ে যায় নি, মরা মাছের চোখের মতো সেগুলো জ্যোতিহীন। রোদ উঠতে এখনও অনেক দেরি।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে শেখরনাথরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখেন খুকুরা আগেই এসে গেছে।

দূর থেকে খুকু অর্থাৎ মণিকা শেখরনাথদের দেখতে পেয়েছিল। হারুণ আর সে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ওদিকে রাজা আর শেখরনাথও থেমে গিয়েছিলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ড তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। লক্ষ করছিলেন, খুকুর ঠোঁট দুটো থরথর করছে। তার মুখে কষ্ট, আনন্দ, অভিমান, অভিযোগ—কত রকমের অভিব্যক্তি যে খেলে যায়!

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, পায়ে পায়ে মেয়ের কাছে চলে এসেছিলেন শেখরনাথ। হঠাৎ পঞ্চাশ বছরের মধ্যবয়সী খুকু বালিকার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তার হাত-পায়ের জোড় যেন বিচিত্র আবেগে আলগা হয়ে

যাচ্ছিল, হুড়মুড় করে সে বাবার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কিন্তু তাঁকে ছোঁয় না।

নিচু হয়ে মেয়েকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে দু'হাতে অনেকক্ষণ জড়িয়ে রাখেন। শেখরনাথ টের পান তাঁর বুক চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন হারুণ। অত্যন্ত সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল চোখমুখ। একসময় তাঁকে কাছে ডাকেন শেখরনাথ। এগিয়ে এসে হারুণ তাঁর পা ছুঁতেই তাঁকেও বুকে জড়িয়ে নেন তিনি।

অডিও সিস্টেমে ঘোষণা করা হয়, ঢাকা ফ্লাইটের যাত্রীরা যেন এয়ারক্রাফটে গিয়ে উঠে পড়েন, উড়ানের আর দেরি নেই।

ধীরে ধীরে হারুণ আর খুকুকে বুকের ভেতর থেকে মুক্ত করে সেই চামড়ার ব্যাগটা থেকে সোনার হার, একজোড়া রুলি আর একটা হীরের আংটি বার করেন। মেয়েকে সেই হার আর রুলি দিয়ে বলেন,'তোকে তো কিছুই দেওয়া হয়নি। তোর বিয়ের জন্য তোর মা এগুলো বানিয়ে রেখেছিল।' হীরের আংটিটা হারুণকে দিয়ে বলেন,'এটা পরো। মাপ ঠিক হবে কিনা জানি না। যদি না হয় সোনার দোকানে নিয়ে গিয়ে ঠিক করে নিও।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

অডিও সিস্টেমে আরেক বার ঘোষণা হতেই হারুণ বলেন,'এবার আমাদের যেতে হবে।'

আস্তে মাথা নাড়েন শেখরনাথ।

হারুণ ফের বলেন,'একবার ঢাকায় আসুন। যাবার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

শেখরনাথ বলে, 'তার আগে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তোমরা এস।'

'আসব।'

হারুণরা সিকিউরিটি এনক্লোজারের দিকে এগিয়ে যান। সেদিকে তাকিয়ে শেখরনাথ মনে মনে বলেন, বেশ ছেলেটি। রক্তের ভেতর জমানো বহুকালের সংস্কারগুলির কথা এই মুহূর্তে তাঁর মনে থাকে না।

---